কখনো কাছে, কখনো দূরে

আশাপূর্ণা দেবী

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬২

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

শ্রীসুনীলকান্তি দাশগুপ্ত
শ্রীমতী গীতা দাশগুপ্ত
স্নেহভাজনেষু

আমার কাছে একটা দূরবীন রয়েছে! দূরবীনটাকে নিয়ে আমি আমার মেজছেলের এই নতুন কেনা তিনতলার ফ্ল্যাটটার পশ্চিমমুখো ছোট্ট ব্যালকনিটায় বসে আছি। ওরা আমার বসার জন্যে একটা বেতের চেয়ার দিয়ে গেছে। চেয়ারটা ভারী সুন্দর শৌখিন, তা সুন্দর না হলে এই ছিমছাম সুন্দর ফ্ল্যাটটিতে মানাবে কেন?

এখন সকাল, তাই পশ্চিমের ব্যালকনিটা বেশ উত্তাপহীন! পূব দিকেরটায় এখনি বেশ একটু রোদ এসে গেছে। বৈশাখের সকাল তো। এখন অবশ্য আর কেউ বৈশাখের সকাল বলে না, বলে এপ্রিলের। তা যাক্‌গে, বলায় কী আসে যায়? এই এপ্রিলের সকালেও তো 'বৈশাখী বাতাসের' লুটোপুটি খেলা। ঠিক, যেমনটি দেখা যাচ্ছে দূরবীনের কাচের মধ্য দিয়ে ওই অনেক দূরটায়।

আমার মেজছেলের এই ফ্ল্যাটটা একদম নতুন পাড়ায়, ওর ব্লকটার পরেই এখনো বেশ খানিকটা ছাড়া জমি পড়ে রয়েছে। বেশীদিন থাকবে না অবিশ্যি, কারণ ধারে-কাছে বেশ কিছু বালি আর পাথরকুচি ঢালা রয়েছে। যেটা অদূর ভবিষ্যতের সঙ্কেতবাহী।

তা হোক, এখনো ওই খোলা জমিটা এই ব্লকটাকে অনেকখানি বাতাসের দাক্ষিণ্য ভোগ করতে দিচ্ছে। দিচ্ছে আরো মহার্ঘ একটি জিনিসও।

জিনিস? 'সৌরভ'কে কী 'জিনিস' বলা যায়? তো আমারা যে কোন কিছুকে বোঝাতে 'জিনিস'ই বলতে অভ্যস্ত। জিনিসটা হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসা খুব পরিচিত আর প্রিয় একটি সৌরভভার। ওই জমিটায় অনেকগুলো হাত মেলে থাকা একটা কাঠচাঁপা গাছ আছে। আর আছে একটা নিমগাছ। কাঠচাঁপা গাছের ফুল আর নিমগাছের ফুল কী চিরকাল একই সময় ফোটে? তা না

ফুটলে ওই নিমফুল আর কাঠচাঁপার মিলমিশ গন্ধটা কেন দূরবীনের ওপারটার বাতাসেও ভেসে বেড়াচ্ছে ?

দূরবীনের কাচের ছায়ায় যা কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে ওই গন্ধ, আর ওই বৈশাখী সকালের হাওয়া কেমন একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার এই দূরবীনটা একটু গড়বড়ে, কখনো মনে হয় বেশ পাওয়ারফুল, কখনো কেমন ছায়া ছায়া।

আমি ওর কাচটাকে একটু মুছে নিচ্ছিলাম, তখন আমার মেজছেলের বৌ এক কাপ চা আর দুটো বিস্কিট নিয়ে এলো। এটা অবশ্য ব্রেকফাস্ট নয়, এমনি 'ফার্স্ট টী'! ব্রেকফাস্টটা খানিক পরে হবে। তখন এদের 'কাজের মেয়ে' 'বৌদিদির' কাজে সাহায্যের হাত লাগবে। আমার মেজছেলের বৌ বেশ করিৎকর্মা মেয়ে, প্রায় প্রতিদিন সকালের ওই 'ব্রেকফাস্টে' কিছু না কিছু নতুন খাবার বানাবে। সেসব টেবিলে ধরে দেবে সুন্দর করে সাজিয়ে।

তখন আমাকে উঠে গিয়ে টেবিলে বসতে হবে। আমার মেজছেলে তখন বলতে শুরু করবে, 'বাবলি এটা বেশ সুন্দর বানায়। বাবলিও এটা খুব টেস্টফুল হয়েছে।'

আমার মেজছেলের বৌয়ের নাম 'ধূপছায়া'। তবে আমার ছেলে 'বাবলি, বাবলি' করে ডাকে। কারণে অকারণেই ডাকে। যেন নামটাকে নিয়ে লোফালুফি করে। শুনে মনে হয়, যেন 'ডাকার সুখেই ডাকা'!

নামটি বৌমার বাপের বাড়ির ডাকনাম! আমার মেজছেলে প্রবুদ্ধ সেটাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসে চালু করে ফেলেছে। আমার বড় ছেলে, বড়বৌ যখন ছুটিতে কলকাতায় আসে তারাও 'বাবলিই' ডাকে। বলে, 'বাবাঃ! 'ধূপছায়া' বলে আবার ডাকা যায় না কী? ওসব নাম হচ্ছে 'ব্যাঙ্ক লকারে' তুলে রাখার মতো। বিশেষ উপলক্ষ্যে বার করে একটুখানির জন্যে ব্যবহার করতে হয়।'

এদের সঙ্গে আমার বড়ছেলে বড়বৌমা বুদ্ধ আর তিস্তার বেশ ভালো সম্পর্ক। যখনই আসে চারজনে মিলে হৈচৈ, বেড়ানো, থিয়েটার-সিনেমা দেখা, আমোদ-আহ্লাদ খানাপিনায় ওদের ছুটির দিন কটা উৎসবতুল্য করে তোলে।

অবশ্য ভাইয়ে ভাইয়ে এই ভাবভালবাসাটি—ওদের দুই জায়ে

দায়ে 'ভাব' আছে বলেই। সম্পর্ক ভালো রেখেছে এই বৌ দুজনই। ওরা 'ভালো' না রাখতে চাইলে শুধু 'ভাইয়ে ভাইয়ে' চাইলে সেটা রাখতে পারতো না কী? মনে হয় না।

ছেলেদের যে নিজস্ব সত্তা আছে, তা তো দেখে মনে হয়না।—তুমি যা বলাও আমি বলি তাই 'তুমি যা করাও আমি করি তাই' ভাব।

এটা অবশ্য আমি আগে ঠিক বুঝতে পারতাম না। কল্যাণীই একদিন বলেছিল হেসে হেসে। আর বলেছিল, বলতেই হবে আমাদের ভাগ্য ভালো। তাই ওদের জায়ে জায়ে সুসম্পর্ক! এরপর আবার ছোটটি এলে কী হয় কে জানে!

তা তার অবশ্য এখন দেরী আছে।

তবে আমার বড়ছেলে-বৌ আমার মেজছেলের এই নতুন ফ্ল্যাটটা দেখেনি। শেষ যেবার এসেছিল, সেই আমাদের 'রিচি রোডের' পুরনো ভাড়াটে বাড়িতেই সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে গেছে।…… সে বাড়িটা অবশ্য ছোট নয়, সকলেরই কুলিয়ে যায়। অনেকদিন আগের আমলের ভাড়া তো। তাই এখনও রিচি রোডের মতো অভিজাত জায়গাতে আমার মতো লোকের থাকতে পারা যাচ্ছে।

কিন্তু সকলের 'কুলিয়ে যাওয়াই' তো শেষ কথা নয়। তাই আমার মেজছেলে নতুন পাড়ার এই ফ্ল্যাটটিকে কিনেছে

এই ফ্ল্যাটটি কেনার খবরে খুব খুশী হয়ে তিস্তা চিঠি দিয়েছিল বাবলিকে।…অবশ্য তার সঙ্গে ওর শাশুড়ীকেও। চিঠিপত্র যা দেবার ওই বড়বৌমাই দেয়। বুদ্ধ চিঠিপত্রর ধারেকাছেও নেই। চিঠি লেখালিখি না কী বুদ্ধর 'বাঘ'।

তো কিছুদিন পরে বাবলিকে চিঠি দিয়েছিল তিস্তা। লিখেছিল, দ্যাখ্ কাণ্ড! অফিস থেকে হঠাৎ দুম করে আমায় কিনা ওই 'ত্রিচুর' থেকে একেবারে 'শ্রীলঙ্কায়' বদলি করে দিল। প্রমোশানটা অবশ্য দারুণ! তবে ভেবে খারাপ লাগছে যাবার আগে একবার কলকাতাটা ঘুরে আসার টাইম দিল না। তোদের নতুন ফ্ল্যাটটা নতুন থাকতে দেখা হলো না। ভাব, একেবারে লঙ্কাপুরীতে। অশোকবনে সীতার অবস্থা। নেহাৎ রামচন্দ্র সাথে তাই রক্ষে। আমার মা অবশ্য বলেছে, একবার ঘুরে আসবে। আমার ছোটবোন বলেছে, লঙ্কা জায়গাটাকে

একবার দেখে চক্ষু সার্থক করে নেব।···তবে আমাদের এ বাড়ির মাকে বাবাকে যে দুদিনের জন্যেও নড়ানো যাবে এমন আশা নেই। এই তো 'ত্রিচুরে' এই তিন তিন বছরেও একবারও এলো না। এতো 'সংসার বাতিক', বাবাঃ।'

কল্যাণীকে 'সংসার বাতিক' বলে ঠাট্টা তার ছেলেরাও করে। এই যে আমার মেজছেলের এই নতুন ফ্ল্যাটে 'গৃহপ্রবেশের' সময় ও আমাদের এখানে নিয়ে এলো! বলেছিলো তো দিনকতক থাকতে। কিন্তু থাকল কই? নিয়মরক্ষা তিন দিন তিন রাত থেকে ছোটছেলে তথাগতকে নিয়ে কেটে পড়ল। রিচি রোডের সেই বাড়িটা যেন কল্যাণীর অভাবে কাঁদতে বসেছিল। আসলে ওইটাকে ও 'নিজের জায়গা' ভাবে। আমাকে বলল, তুমি থাকো না কিছুদিন। তোমারও দুদিন আমার 'বাক্যজ্বালা' থেকে রেহাই পেয়ে হাড় জুড়োবে, এদেরও ভালো লাগবে।

এই রকমই বাকভঙ্গিমা কল্যাণীর।

তো আমি থেকেই গেছি আজ দিন কুড়ি হলো। সত্যি বলতে একটু চক্ষুলজ্জার দায়েই থাকার সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলাম। এরা এতো আগ্রহ দেখাচ্ছে, অথচ আমরা সবাই মিলে চলে যাবো?··· ভালো দেখায়? আমার ছোটছেলের না হয় কলেজের ছুতো, আর তার মায়ের ছুতো ছোটছেলের 'ভাতজল' করার। কিন্তু আমার? আমি রিটায়ার্ড মানুষ, আমার কী ছুতো আছে?

তা আমার তো এখানে ভালোই লাগছে। বেশ খোলামেলা! সেই অনেক আগে আমরা প্রথম যখন রিচি রোডে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলাম তখন সেখানটা যেমন খোলামেলা ছিলো।···এখন আর সে পাড়ায় আলপিন ঢোকাবার ঠাঁই নেই। ওই ম্যাডক্স পার্কটা আছে, তাই ফুসফুসে একটু হাওয়া বয়।

আমার ছোটছেলে অবশ্য বলেছিল, মায়ের চলে আসার কী দরকার? আমার একার ব্যাপার সুবোধদাই তোফা ম্যানেজ করতে পারবে। কিন্তু কল্যাণীর ওই বুড়ো বয়েসের কোলের ছেলেটিকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি আছে। যে ছেলে আর একটা বছর পরেই ডাক্তার হয়ে বেরোবে, তাকেই উঠতে বসতে স্বাস্থ্যবিধি শেখায় কল্যাণী।···'বুড়ো

বয়েসেই' বলা চলে। প্রবন্ধর থেকে পুরো দশ বছরের ছোট তথাগত। যখন 'সম্ভাবনা' তখন কল্যাণী একেবারে 'লজ্জায়' লজ্জাবতী লতা। বড়, মেজ ছেলেদের সামনে যেন মুখ তুলতেই পারে না।

আর সেই 'সম্ভাবনা' যখন মূর্তি নিয়ে দেখা দিল? তখন?

সত্যি বলতে তখন এতো বাড়াবাড়ি যত্ন যে, আমারই মনে হয়েছে কল্যাণী যেন ছেলে নিয়ে একটু বেশী আদিখ্যেতা করছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এটা কী কল্যাণীর পূর্ব মনোভাবের প্রতিক্রিয়া?··· এই দশ বছর পরে তৃতীয় সন্তানের 'আগমন' সূচনা কী ও ভীষণভাবে অবাঞ্ছিত মনে করেছিল? এবং তার জন্যে কিছু ভয়ংকর প্রার্থনা জানিয়েছিল ভগবানের কাছে?

কি জানি সেটা ভগবানই জানেন। তবে ওর ওই সদ্যোজাতটিকে নিয়ে 'হারানিধি'তুল্য ব্যবহার দেখলে মাঝে মাঝে আমার সেই রকম একটা সন্দেহ হতো।—একটু লজ্জা লজ্জা ভাব আমারই কী হয়নি? কিন্তু কী আর করা যাবে? হঠাৎ একটা ফাঁস জড়িয়ে ফেলাই হয়েছে যখন, মেনে নেওয়া ছাড়া গতি কী?

আমার বড় মেজ ছেলের জন্যে কখনো বাহন রাখার ব্যবস্থা হয়নি। সেকথা মনেও পড়েনি আমাদের। তিন বছরের ছোট বড় দুটো ছেলেকে নিয়েই কল্যাণী সংসারকে সর্বতোভাবে ম্যানেজ করেছে। অথচ ছোটছেলের সময়ই ধরে বসলো, একটা ছোট ছেলে-টেলে খোঁজো। আমি সবসময় চোখ রাখতে পারি না।—

তা তখনো খোঁজ-টোজ করলে ওরকম এক আধটা হাফপ্যান্ট পরা ছেলে জুটতো বাচ্চাটাচ্চাকে ধরতে। এখন ও দৃশ্য ভাবাই যায় না। এখন তো পুরনো নাম নেই, এখন 'কাজের লোক'। তো সেই 'কাজের লোক' মানেই প্রমীলাকুলের একটি।

তখন সুবোধকে পাওয়া গিয়েছিল। তদবধি রয়ে গেছে সুবোধ, 'ছোড়দাবাবুর' গার্জেন এবং 'ভৃত্য' উভয় ভূমিকায়। তবু কল্যাণী তার মেজছেলের এই নতুন কেনা সুন্দর ফ্ল্যাটটায় তিন দিনের বেশী থাকতে চাইল না। ওর এই চক্ষুলজ্জাবিহীন কাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আমার এই থাকা।—

আমার মন্দ লাগছে না।

এখনো এখানে একটু নিভৃতি আছে। যেটুকুর দাক্ষিণ্যে হঠাৎ হঠাৎ দূরবীনটা বন্ধ বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ে আমায় এই বারান্দাটায় বসিয়ে রাখতে চায়।

এই বারান্দাটা সত্যিই বেশ সুন্দর। এখান থেকে ওই কাঠচাঁপা আর নিমগাছটা চোখে পড়ে। আর ভোরবেলা যে হঠাৎ হঠাৎ এক একটা চেনা চেনা পাখির ডাক কানে আসে, সে বোধহয় এই দিক থেকেই। হ্যাঁ, ওই ডাকগুলো যেন চেনা চেনা।

তবে চেনা শব্দের থেকেও চেনা গন্ধ বেশী শক্তিশালী। ও এক নিমেষে, বহু বহু দূরের পথ পার করে নিয়ে গিয়ে সেই গন্ধটার মূল কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলতে পারে।

বহুদূরের পথই। কে জানে কত যোজন!

সেই পথের ওপারে ওই চাঁপা আর নিমের গন্ধবাহী বাতাসে আমি একটা ছোট ছেলেকে দেখতে পেলাম। ছেলেটার খালি গা, পরনে একটা ছোট্ট ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরানো। তবু তার আঁটসাঁটত্বটি ঢিলে হয়ে যাওয়ায় ধুতিটা ওই ছেলেটার কোমরটাকে ঘিরে আটকে থাকতে চাইছে না। খসে পড়তে চাইছে।—ছেলেটা এক হাতে তাকে পেটের ওপর ধরে রাখবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে কখন একসময় চেষ্টায় হার মানলো, খেয়াল করলো না।

ছেলেটা সেই দিগম্বর অবস্থায় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সামনের দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে।—

এসব কী? এসব কেন? এসব কখন হলো?

মানেটা কী এর?

কখন যেন সেই সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুমার কাছে আরো কতজনেদের সঙ্গে যেন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপর কে কখন তাকে তুলে এনে মায়ের ঘরে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিলো কে জানে!—রাতে কখন যেন একবার আবছা আবছা জেগে হাত বুলিয়ে দেখেছিলো, বিছানায় তার দুদিকে দুজন। মা বাবা। আরামে শান্তিতে নিশ্চিন্ততায় সেই আবছা জাগাটা আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলো।—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড একটা চেঁচামেচিতে। ঘর অন্ধকার! দুদিকে হাত বুলিয়ে কাউকে পেল না। ভয়ে কাঁটা হয়ে 'মা' বলে চেঁচিয়ে

উঠতে গেল, গলা দিয়ে শব্দ বেরোলো না।

অথচ ঘরের বাইরে কী ভীষণ চেঁচামেচি! অনেকে মিলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে না কী?—না কি রাত্তিরে যেমন একসঙ্গে অনেক শেয়াল ডেকে ওঠে, অনেক কুকুর ডাকতে থাকে, শুনে ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায়, আর তখন সাট্টেপাট্টে মাকে জড়িয়ে ধরে মার শরীরের কোনোখানে মুখ গুঁজে রাখে, সেই রকম ঘটছে এখন। কিন্তু এখন মা কোথায়? পুরো বিছানাটার দুদিকই খালি।

বালিশেই মুখ গুঁজে মনে মনে চেঁচাতে লাগলো ছেলেটা, মা। মা। তুমি কোথায়? বাবা। তুমিই বা কোথায়? ওইসব শব্দয় আমার ভীষণ ভয় করছে, বুঝতে পারছ না? আমায় একলা ফেলে তোমরা উঠে গেলে কেন?—মনে মনে চেঁচাতে চেঁচাতে হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেটা বিকটভাবে।

তখন কে যেন এসে ভেজানো দরজাটা ঠেলে খুলে ঘরে এলো। কে? কে জানে! ছেলেটা তো তখনো পর্যন্ত চোখ খোলেনি। হঠাৎ খুলে ফেলে দেখলো খোলা দরজার ওপারে সকাল হয়ে যাওয়া আলো! সকালের আলোয় ছেলেটা ধড়মড় করে বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, পরনের ধুতিটা ধরে। একসময় ছেড়ে গেল সেটা।

তার বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের সামনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য।—ঘরের সামনের উঁচু দাওয়ার নীচে যেখানটাকে সবাই 'উঠোন' বলে, যেখানে বৃষ্টির দিন ছাড়া সবসময় দুখানা ফাটাচটা ঢাউস ঢাউস চৌকি পাতা থাকে আর সক্কলের সব কাজ চলে তার ওপর।

হ্যাঁ, ছেলেটা তো দেখে, সক্কালবেলা ঠাকুর্দা ওখানে বসে বসে তামাক খায়, আর ঠাকুর্দার কাছে কতো সব যেন লোক আসে।—খানিক পরে বড়জ্যাঠা মেজজ্যাঠাও এসে বসে। কিসের যে সব কথা হয়!

তার মধ্যেই আবার আর একটা চৌকির ওপর 'মহামায়া পিসি' বাড়ির সব ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে ছোট ছোট চুপড়ি করে মুড়ি-মুড়কি রাখে। আর পিসি এসে একটা থালায় অনেকগুলো নাড়ু আর কিছু কাটা ফল এনে ধরে দেয়।

তার মানে ঠাকুর্দার ঠাকুরঘরের পুজোটুজোর কাজ সারা হয়ে গেছে

এর আগেই, এগুলো ঠাকুরের 'পেসাদ'।

সঙ্গে সঙ্গে বড়জ্যেঠি একটা বড় ঘটি ভরে বিচ্ছিরি তেতো তেতো কী একটা জল আনে, আর সব ছেলেমেয়েগুলোকে হাঁ করতে বলে, আর একটা ছোট্ট গেলাসে সেই ঘটির থেকে জল নিয়ে সক্কলের সেই হাঁয়ে খানিকটা করে ঢেলে দেয়। সবাই আঁ আঁ কী বিচ্ছিরি তেঁতো বলে হাঁকপাঁক করে ওঠে। তখন দেখা যায় মহামায়া পিসি এক ধামি ভিজে ছোলা নিয়ে এসে গেছে। তাই থেকে মুঠো মুঠো এক একজন নিপীড়িতর মুঠোয় চালান করে।

ওই তেতো জলটা গেলার পুরস্কার ওই ছোলাভিজে। তারপর পেসাদ আর মুড়িমুড়কি।

আবার পরে কখন ওই চৌকি দুটোয় জল ঢেলে পরিশুদ্ধ করা হয়ে যায়, এবং ঠাকুমা এসে বসেন কুটনোর ঝুড়ি নিয়ে। আশেপাশে জ্যেঠিরা, 'পিসি' এবং 'মহামায়া পিসি'।

ওর ওপরই কুটনো কোটা হয়, শীতের সময় রোদ পোহানো হয়, আবার কখনো কখনো 'গঙ্গাজল' না কি ছিটিয়ে কুলোয় করে বড়ি দেওয়া হয়।—

ওখানেই আবার যত রাজ্যির মেয়েদের চুলও বাঁধা হয়। আবার সন্ধ্যার পর যখন হাওয়া বয়, আর সেই হাওয়ার সঙ্গে কীরকম সব ফুলের পাতার গন্ধ ভেসে আসে, তখন আবার চৌকি দুটো জুড়ে বাবার জ্যাঠামশাইদের আর ঠাকুর্দার গল্পের আসর বসে। দালানের মধ্যে তখন, বাড়ির ওই ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে ভাত খেতে বসানো হয়। দু-একজন নিজে নিজে আলাদা খায়, বাকি সকলকে পিসি কী মেজজ্যেঠি একখানা বড় থালায় ভাত মেখে বড়বড় 'গরস' করে খাইয়ে দেয়।—আর একটু এদিক-ওদিক করলেই চাপা গলায় শাসায়, খবরদার! একদম টুঁ শব্দ করবে না। দেখছো না সামনে কারা রয়েছেন।

যেদিন চাঁদের আলো থাকে, সেদিন বোঝা যায় 'কারা' রয়েছেন। কিন্তু যেদিন চাঁদের আলো থাকে না? সেদিন শুধু এক একটা ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।—খোলা উঠোনের ওপর ওই ছায়াদের দেখলে ছেলেটার কেমন গা শিরশির করে। ওদের আর তখন ঠাকুর্দা কী

জ্যাঠা কী বাবা মনে হয় না, মনে হয় ভূত। ভয়ে ওই খোলা দরজার দিকে তাকায় না সে।—

কিন্তু সেদিন? তখন? ছায়া ছায়া অন্ধকার তো নয়। চাঁদের আলোর বদলে সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে উঠোনটায়।—তবু ছেলেটার গা শিরশির করে ওঠে কেন?

উঠোনে পাতা সেই চৌকি দুটো কোথায় গেল? দেখা যাচ্ছে না তো?—দেখাই বা যাবে কী করে? উঠোনটা ভরে কত কত লোক যে। এরা কে? এরা সবাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে কেন? ঠেলাঠেলি করে কী দেখতে চাইছে?

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে ওরা 'কী' দেখতে চাইছে। ওই উঠোনটাতেই যে একটা তুলসী মন্দির আছে, যেখানে ঠাকুমা পিসিমা মা জ্যেঠিমারা—এমনকী 'দিদিরাও' সন্ধ্যাবেলা হাতজোড় করে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে, প্রদীপ জেবলে দেয় আর বিড়বিড় করে বলে, 'তুলসী তুলসী নারায়ণ তুমি তুলসী বৃন্দাবন। তোমার তলায় দিলাম আলো অন্তিমকালে কোরো ভালো।—তোমার তলায় ঢালি জল অন্তিমকালে দিও স্থল।'

'অন্তিমকাল' তা জানে না ছেলেটা, তবু রোজ কেবলই শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

তো সেই তুলসী গাছটার তলার কাছে একটা লোক মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছে কেন? আর যেন তাকে দেখতেই সবাই ভিড় করছে।

লোকটা কে? ওখানে ঘুমোচ্ছে কেন? রাতে খুব গরম হচ্ছিল? বেশী গরম হলে তো সবাই উঠোনে শোয়। কিন্তু সে তো চৌকিতে, কিংবা রামভজনদের বাড়ির মতন দড়ি টানা-টানা চারপাইতে। অমন বিচ্ছিরি করে মাটিতে কেন? কে ও?

মানুষের দেয়ালের আড়াল থেকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না ছেলেটা, লোকটা কে? তাছাড়া যে ঘুমোচ্ছে তার গা-টা একটা সাদা চাদরে ঢাকা।—বড়জ্যাঠাকে দেখতে পাচ্ছে, ওই ঘুমনো লোকটার পাশে কীরকম গোঁজা মতো হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আর লোকটার মাথার কাছে ঠাকুর্দা পুজোর ঘরে বসার মতো চোখ বুজে চৌকো হয়ে বসে আছে পিঠ সোজা করে।

ছেলেটার হঠাৎ মনে হলো, লোকটা বোধহয় ঘুমোচ্ছে না, বোধহয় মরে গেছে। একেই কী তাহলে 'অন্তিমকাল' বলে? তাই তুলসী গাছের তলায় শুয়েছে, তুলসী গাছ ওর ভালো করবে বলে? কী ভালো করবে? মরে গেলে কী তার আর কিছু ভালো হয়?—আশ্চর্য! ছেলেটা তো তার আগে কারো মরে যাওয়া দেখেনি। তবু কী করে ওই কথাটাই তার মনের মধ্যে এসে গেল? ঠিক। ঠিক। লোকটা মরে গেছে। আর তাই ঠাকুমা, পিসি আরো সবাই অমন গলা চিরে চেঁচিয়ে কাঁদছে!

ছেলেটা দাওয়া থেকে নেমে ওখানে যেতে পারছে না। কারণ অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে উঠোনে নামতে হয়। আর সেই সিঁড়িগুলো জুড়েই গাদা গাদা লোক বসে আছে। উঃ! হঠাৎ এতো লোক এলো কোথা থেকে? সত্যনারায়ণ পুজোর দিন অনেক লোক আসে দেখেছে ছেলেটা, কিন্তু সে তো সন্ধ্যেবেলা। এখন কী পুজো?

ভারী ব্যাকুলতা আসছে। তবু অবাক চোখে দাঁড়িয়েই আছে।

মা-ই বা গেল কোথায়? বোঝা যাচ্ছে না। রান্নাঘরের সামনের দালানে কত জনাই ঘোমটা দিয়ে বসে রয়েছে। তার মধ্যে কে তার মা কী করে বুঝবে?

আসলে একমাত্র রাত্তিরের অন্ধকারে নিঃঝুম ঘুমের মধ্যে, হাত বাড়িয়ে আর বিছানায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে 'মা' নামের ভালোবাসাটিকে অনুভবে পায় ছেলেটা। তখন বুঝতে পারে 'মা' বলে একটা খুব নিজস্ব জিনিস আছে তার।

কিন্তু দিনের বেলা সে অনুভূতিটাকে আর খুঁজে পায় না। ওই রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর খাবারঘরের চৌহদ্দির মধ্যে ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো সকলেই যেন এক হয়ে যায়। মা পিসি জ্যেঠিরা। বরং বেশী সজীব-সতেজ মহামায়া পিসি।

তা এখন তো মহামায়া পিসিকেও দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা অসহায়তার অনুভূতি যেন ছেলেটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। আর সেই ঝাঁকুনিতে সে হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। পরিত্রাহি চীৎকারই। এতোক্ষণকার অজানিত রহস্যময়তা যেন ওই ছোট্ট ছেলেটাকে গলা টিপে ধরে রেখেছিল।—এই চীৎকার সেই

দম-আটকানো যন্ত্রণাটার বহিঃপ্রকাশ।

এই চীৎকারে মহামায়া পিসি ছুটে এলো। ওকে কোলে তুলে নিয়ে নিজেও 'হু-হু' করে কেঁদে উঠলো।

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো, 'ও কে? ও ওখানে শুয়ে কেন? আমার ভয় করছে।'

কিন্তু ছেলেটা নিজে কে?

কত বয়েস ছিলো তখন ছেলেটার?

আর তার প্রশ্নের উত্তরটাই বা কী?

হ্যাঁ, এই সব প্রশ্নেরই উত্তর মিলেছিলো। পরে পাঁচজনের মুখে মুখে বারবার শুনতে শুনতে 'স্মৃতির শিকড়টা' পোক্ত হয়ে যায়।—

ছেলেটার বয়েস তখন সাড়ে চার।

আর ওই ছেলেটাই না কী 'আমি'। কী হাস্যকর কথা! ওই হাঁ হাঁ করে কাঁদতে থাকা ছেলেটা কিনা আমি! যে 'আমি' আমার মেজছেলের নতুন ফ্ল্যাটের পশ্চিমমুখী বারান্দায় এই সকালবেলা চাঁপা আর নিমফুলের মিশ্রিত সৌরভে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি। তার মানে ওই সাড়ে চার বছরের ছেলেটার এই লম্বা-চওড়া নামটা! নরনারায়ণ চৌধুরী!

আর ওই অছুৎ জায়গায় শুয়ে থাকা লোকটা?

ওই ছেলেটার বাবা।

বাবা!

আমার মেজছেলের বৌ বাবলি এসে ডেকে উঠলো। ভারী কোমল সুরেলা গলা! গলার স্বরেও যে এমন মসৃণতা থাকতে পারে তা এই ডাকটি না শুনলে হয়তো জানতেই পারতাম না।—আমি দূরবীনটা নামিয়ে রেখে ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম।—ওর এখনো স্নান হয়নি। খোপা তো বাঁধে না এবং বাসি বেণীটা পিঠে পড়ে আছে, কপালের ওপর ঝুরোঝুরো চুল হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। ও একটা হালকা বেগুনীরঙা শাড়ি পরে রয়েছে, শাড়িটার পাড় নেই!

ওর মুখে এখনো যেন বালিকার লাবণ্য।

ওকে যেন ওই বাবলি ডাকটাই মানায়। তবে আমি 'বৌমা'ই বলি। ওটাই আমার পছন্দ। নাম ধরে তো সব্বাইকেই ডাকা যায়। পাড়ার মেয়েটা থেকে 'কাজের মেয়েটাকে' পর্যন্ত। 'বৌমা' আর কাউকে বলতে পারা যায়? সেখানেই তো বিশেষত্ব। আর সেই-খানেই তো মর্যাদা।—অবশ্য আমার ছেলেরা এ কথায় হাসে। বলে আমি এখনো 'গাঁইয়া' আছি।

তা বোধহয় আছি। তাই ওই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো কেন, আচ্ছা এই মেয়েটা যদি একখানা সাদাখোলের লালপাড় শাড়ি পরে ঘোমটায় মুখ ঢেকে ঘুরে বেড়াতো ওকে কি এমন 'বালিকা বালিকা' দেখাতো?

বোধহয় দেখাতো না। তা দেখালে গিন্নীদের দঙ্গলে মিশে যেতো কী করে? আলাদা করে চেনা যেতো না তো। না কী হয়তো দেখাতো 'বালিকা বালিকা', বোঝা যেতো না। মুখটা তো ঘোমটার আড়ালে ঢাকা থাকতো!

ঘোমটা বিদেয় হওয়ায় মেয়েদের মুখের রেখাটেখাগুলো পড়তে পারা যায় এখন, এটা একটা মস্ত সুবিধে!

বাবলি অথবা ধূপছায়া, অথবা 'মেজবৌমা' একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললো, এখানে খবরের কাগজওয়ালা এতো দেরীতে আসে! আপনার নিশ্চয় খুব খারাপ লাগে। বরাবর তো সক্কালবেলা কাগজটা নিয়ে বসাই অভ্যাস!

কথাটা সত্যি! সকালবেলা চায়ের নেশার থেকেও বোধহয় বেশীই আমার কাগজের নেশা! ও তা জানে। দেখেছে তো অনেকগুলো দিন।

ওখানে রিচি রোডের পাড়ায় খুব ভোরেই 'রোল' পাকানো কাগজ দুখানা দোতলার বারান্দায় ঠক্ করে এসে পড়তো।—এখানে নতুন পাড়ায় একমাত্র পুরুষদের অফিস যাওয়া আর বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া ছাড়া, টাইমমাফিক কিছুই হয় না। সবই যেন গয়ংগচ্ছ। বাসন-মাজুনি আসে কত বেলায়, কাগজওলা আসে আরো বেলায়।—তা সে যাই হোক, এতে বাবলির এমন কুণ্ঠিত হবার কী আছে? মনে মনে ক্রমশ আমিও দেখছি ওকে বাবলিই বলতে শুরু করে ফেলছি।

কই ওখানে দৈবাৎ কোনো বৃষ্টিবাদলের সকালে কাগজ আসতে দেরী হলে, আমার যে খারাপ লাগছে, এ কথা তো ওকে ভাবতে দেখিনি। বরং আমার ছেলেরা দেরীর জন্যে আমার ছটফটানি দেখে আমার 'নেশা' নিয়ে হাসাহাসি করেছে ওদের মায়ের সঙ্গে।

অথচ এখানে ও অনুভব করছে কাগজ আসতে দেরী হওয়ায় আমার খারাপ লাগছে। তার মানে মেয়েটার সৌজন্যবোধটি বেশ বেশী। এ বাড়িটা যে ওর, আর নরনারায়ণ চৌধুরী যে এ বাড়ির অতিথি, তা বুঝে ফেলেই, অতিথির অসুবিধেয় কুণ্ঠিত হচ্ছে।

কিন্তু আমার কী খারাপ লাগছে? কই? এই অন্য একটা পরিবেশে আমার নেশাটা যেন ফিকে মেরে গেছে! আমি সকালবেলা এদের এই ছায়া ছায়া শান্ত স্নিগ্ধ পশ্চিমমুখী বারান্দাটায় এসে বসলেই ওই গন্ধটা পাই। ওই নিমফুল আর চাঁপাফুল মেশা গন্ধ। আমি কোথায় যেন তলিয়ে যাই! তো সেকথা তো আর বলা যায় না বাবলিকে। তাই বলে উঠি, না না, মোটেই আমার কিছু খারাপ লাগে না। মনেও পড়ছে না। জায়গা বদল করে দেখছি নেশাটা কেটে গেছে। নেশাখোর লোকদের এ দাওয়াইটা বাত্‌লে দিলে হয়।

বাবলি হেসে ওঠে। ভারী সুন্দর নরম আর সংযত হাসি। হেসে বলে, তাতে স্থায়ী উপকার হয় এমন গ্যারান্টি তো দিতে পারবেন না।—আবার নিজস্ব জায়গায় ফিরে গেলেই হয়তো যে কে সেই হবে।

নরনারায়ণ চৌধুরীকেও অবশ্য একটু হাসতে হলো।—তা যা বলেছো। 'নিজস্ব' জায়গাতেই মানুষের আসল স্বভাবটি ধরা পড়ে।

চায়ের টেবিলে এসে বসতেই আমার মেজছেলে প্রবুদ্ধ, যেটা ডাকনামে কেমন করে যেন 'প্রভু' হয়ে গেছে, হেসে সেও বলে উঠলো, বাবা! তুমি ভোরে ভোরে ওঠো বটে কিন্তু ভোরের হাওয়ায় দিব্যি একখানা ঘুমিয়ে নাও দেখি।

ঘুমিয়ে! ঘুমোই কী বল?

আহা, সে কী আর তুমি নিজে বুঝতে পারো? না ঘুমোও তো ঝিমোও। দেখেছি উঁকি মেরে।

আবার হেসে ওঠে।

জঙ্গীপুরের চৌধুরীবাড়িতে বাপ-জ্যাঠা-কাকাকে কখনো 'তুমি' করে কথা বলার রেওয়াজ ছিলো না, এরা মানে কল্যাণীর পুত্ররা সেটা চালু করেছে। কল্যাণীরই ইচ্ছেয়। বলেছে, বাপকেও 'আপনি' বলা! শুনলে কেমন যেন লাগে! যেন পর পর দূর দূর। যেন দূরসম্পর্কের আত্মীয়। না বাপু, ওদের আমি মা-বাপকে আপনি ডাকতে শেখাবো না।

তা সত্যি বলতে মাকেও আপনি বলতে শুনেছি ওই জঙ্গীপুরে। জেঠারা ঠাকুমাকে 'আপনি' বলতেন। হ্যাঁ, পাঁচজনের সাক্ষ্যসাবুদে সেই বাচ্চা ছেলেটাকেই 'আমি', বলে মেনে নিতে হয়েছে। যদিও তখন তাকে কেউ নরনারায়ণের মর্যাদা দিতো না। বলতো 'নাড়ু'! আর সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায়ও ছিলো না। ভারী কড়া শাসন ছিলো বাড়ির। তো সেই 'নাড়ু' নামবহনকারী 'আমি'র বাবাটি যে তার মাকে কী বলতো, আপনি না তুমি, তা তো আর দেখা হয়ে ওঠেনি আমির বা আমার।

প্রভু বললো, বাবা, এই ভেজিটেবল স্যাণ্ডুইচটা খেয়ে দেখো! বাবলি এটা যা ফার্স্ট ক্লাস করে।—ধরতে পারা যায় না ভেজিটেবল! কী সব যেন দাও এতে বাবলি?

বাবলি হেসে উঠে বলে, আহা! বলে ফেলে সিক্রেটটি নষ্ট করি আর কী!

চায়ের টেবিলে অথবা খাবার টেবিলে বিশেষ একটু সরসতা আনবার চেষ্টা করে এরা। বোঝা যায় চেষ্টাই। যেটা আগে কখনো লক্ষ্য করিনি। বোধহয় এটা এ পাড়ার ফ্যাশান।

আমিও ওদের চেষ্টায় যোগ দিই কখনো কখনো। যেমন এখন বললাম, ঠিকই তো। বলে ফেলবে কেন? পাকা রাঁধিয়েদের নিজস্ব কিছু কিছু সিক্রেট থাকে। যেটা থেকেই বিশেষ স্বাদ আসে।

আমার ছেলেবেলায় আমার পিসি, প্রায়ই আমাকে চুপিচুপি বলতেন, এই, ওই ঘাটপুকুরের ধার থেকে চারটি আমরুল শাক তুলে আন দিকিন। কাউকে দেখাবি না। খবরদার। এক চিলতে কলাপাতে মুড়ে নিয়ে আসবি।

ও দিয়ে কী হয় পিসি?

ইস ! তোকে বলি আর তুই সবাইকে বলে বেড়া।

বলবো না। বলবো না। তিন সত্যি।

আরে ধ্যেৎ। এতো তুচ্ছ কারণে 'তিন সত্যি' করতে নেই। ওই আমরুল পাতা ছেঁচে রস দিলে এক একটা বেন্নুতে আলাদা একটা 'তার' হয়, বুঝলি ? নুনঝাল মসলার সঙ্গে ওই যে একটু টক ভাব আসে, তাতেই।

আমার সঙ্গে পিসির ছিলো আলাদা একটা আঁতাত। অথবা পিসির সঙ্গে আমার।

আমার যে বাবা নেই আর আমার মা আমার মামার বাড়িতে চলে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেতে পায়নি, এটা পিসিকে বিগলিত করে রেখেছিলো।

'নিয়ে যায়নি' নয় ! নিয়ে যেতে পায়নি। সেটা আমি ওই অল্প-বয়সেই বুঝে ফেলেছিলাম। হয়তো সবাই সেটা বুঝতো, তবু আমার জ্যাঠতুতো দাদা-দিদিরা আমায় হ্যানস্থা করতে ইচ্ছে হলে বলতো, 'যার মা যাকে ফেলে রেখে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকে, সে আবার কথা বলতে এসেছে !'

এটা কি ওরা না বুঝে বলতো ? অবোধ বলে ? তা মোটেই নয়। ওরা বুঝতে পারতো ওই কথাটা আমার পক্ষে মর্মান্তিক কষ্টের আর অপমানের, তাই বলতো। এ এক ধরনের নিষ্ঠুর আমোদ।

ওরা জানে আমি চেঁচিয়ে এ কথার প্রতিবাদ করতে পারবো না। কারণ একদিন বোধহয় আমি চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলাম, 'নিয়ে যায়নি বৈকি ! মিথ্যুক কোথাকার ! ঠাকুর্দা তো যেতে দেননি।'

এর জন্য মেজজ্যাঠার কাছে অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছিলো আমায়। মেজজ্যাঠাই ছিলেন সারা সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কী সূত্রে বা আইনের কোন ধারার বলে তিনি এই অধিকারটি অর্জন করেছিলেন, তা আমার জানা ছিল না। তবে এটা দেখা ছিলো, বাড়িতে যে কেউ যে ধরনের অপরাধ করুক, তাকে শাসানো হতো, 'মেজবাবুকে বলে দিচ্ছি, রোসো।—চলো মেজজ্যাঠার কাছে।—মেজবাবু জানতে পারলে মজা টের পাবি।' ইত্যাদি জোরালো ভাষায়।

আমার অপরাধটি তো অত্যন্তই গর্হিত ছিলো। হলোই বা মাত্র সাড়ে চার ছাড়িয়ে পাঁচে পড়া ছেলে! তা বলে এতো দুঃসাহস ক্ষমা করা যায়? স্পষ্ট ভাষায় ঠাকুর্দার নামে দোষারোপ! এ ছেলে পরে আর এই জঙ্গীপুরের চৌধুরী বংশের ভব্যতা সভ্যতা শিক্ষা সহবতের ধার ধারবে, যদি না এইবেলা কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়!—কথায় বলে না—'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাঁশ টাঁশ।'

সাড়ে চার বছর বয়সে কোন জ্ঞান কতখানি অর্জন করা উচিত, সে জ্ঞান না থাকায়, পদে পদেই শাস্তি পাওনা হতো। এমনি মুশকিল, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আমার বয়েসের কোনো ছেলেমেয়ে বাড়িতে ছিলো না তখন। হয় আমার থেকে বড়, নয় আমার থেকে কিঞ্চিৎ ছোট। কাজেই আমার চোখের সামনে এমন কোনো 'আদর্শ শিশু' ছিলো না যাকে দেখে কর্তব্য নির্ধারণ করা যায়।

সাড়ে চার বছর বয়েসটা অবশ্য এমন কিছু কম নয়! সেদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনে এই আমিই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া—তার আগে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার অকেশানও আসেনি। সেদিন এসেছিলো। তাই আমি তার কদিন পরেই বুঝে ফেললাম, আমার বাবা মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় 'হার্টফেল' না কী যেন করে মারা গেছে। আর সেই সময় আমার মায়ের পেটে আমার একটা ভাই কিংবা বোন অন্ধকারের মধ্যে বাড়ছে।—

বাবা মারা যাওয়ায় কী আমার খুব কষ্ট হয়েছিলো? কী জানি। 'খুব' কিনা বুঝতে পারিনি। বাড়ির একটা জানাচেনা লোক হঠাৎ উবে গেলে যে একটা কষ্ট হতেই পারে, তার বেশী হয়েছিলো কিনা জানি নে।

বাবার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎই বা হতো কতটুকু? বাবা নাকি 'সেরেস্তা' না কোথায় কী যেন কাজ করতো, খুব সকালে বেরিয়ে যেতো, আমি তখন ঘুমোতাম। আবার যখন দুপুরবেলা নাওয়া-খাওয়া করতে বাড়ি ফিরতো বাবা, তখন আমাকে দুপুরের খাওয়া সেরে অন্ধকার ঘরে ঘুমোতে যেতে হতো। এটা অবশ্য একা আমাকেই নয়, বাড়ির সবকটা ছেলেকেই। এটাই সে বাড়ির রীতি ছিলো। যতদিন

না ইস্কুলে ভর্তি হচ্ছো, ততদিন যে ছেলে সারাদুপুর ছাড়া গরুর মতো ঘুরে বেড়াবে, রোদ লাগাবে, ভাত গিলে উঠেই আবোচ-খাঁবোচ খাবে, এসব চলবে না। আজেবাজে বাঁড়িতে এসব চলে, এই চৌধুরী বাড়িতে নয়। অতএব বারোটা বাজবার আগেই ছোটদের খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে জগু দাদার হেফাজতে ধরে দেওয়া হতো। নীচের তলার একখানা মস্ত ঘর, তাতে মস্ত দুটো চৌকি পাতা। তার ওপর বালক বাহিনীকে চড়িয়ে দিয়ে জগুদা ঘরটাকে আটেকাঠে বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকার করে ফেলে, একখানা হাতপাখা নাড়তো, আর খোনা, খোনা গলায় বলতো, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ! মনিষির গন্ধ পাঁউ, যে ছেঁলেটা তাঁকিয়ে থাঁকে, তাঁর চোঁখ খুঁবলে খাঁউ।'

সবাই জানি, এটা জগুদারই কারসাজি, তবু সেই ভরদুপুরে অন্ধকার ঘরে ওই খোনা গলার ঘোষণা আমাদের হাত-পা হিম করে দিতো। গায়ে কাঁটা ধরতো, দাঁতে দাঁতে খিল। কারণ আরো একটা ব্যাপার, সেই কণ্ঠস্বর আবারও বলতো, 'অঁন্ধোকারে আমার চোঁখে মাঁনিক জঁবলে, দেঁখতে পাঁচ্ছি কেঁ তাঁকাচ্ছিস।'

অতএব সারাদুপুর প্রাণপণে চোখের পাতা বুজে পড়ে থেকে যমযন্ত্রণা ভোগ করা।—হয়তো কদাচ ঘুমও এসে যেতো। তবে বেশীর ভাগ দিনই দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থেকে মিনিট গোনা, কখন চারটে বাজবে।

চারটে বাজলে জগুদা দরজা খুলে দিতো। কিন্তু জগুদা কি খাওয়া-দাওয়া করতো না? করতো। একসময় পাখা থামিয়ে বলতো, যে যেমন আছিস, ঠিক তেমনি থাক। আমি আসছি। উঠবি তো একানড়ে এসে চোখ খুবলে নেবে। আমার এক তুতো দাদা বলতো, 'একানড়ে না কচুপোড়া। তুমিই তো খোনা করে কথা বলো।'

জগুদা বলতো, 'তাই বুঝি? তাহলে চোখ খুলে আর ওঠাউটি করে দ্যাখ্ কী হয়। টুঁ শব্দটি হয়েছে কী—

চলে যেতো দরজাটার বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে।

সত্যি বলতে, যে যতো দুঃসাহসীই হোক, চোখ খুলতেও সাহস করতো না, টুঁ শব্দটি করতেও নয়। শুধু অন্ধকারে পরস্পর ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি।—চৌকিটার ওপর মাদুর মতো কি একটা

পাতা থাকতো, জগন্দা বলতো 'শেতলপাটি', ব্যস ওই পর্যন্তই। বালিশটালিশের বালাই থাকত না।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দুপুরে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা, আয়েসী করে তোলবার জন্যে তো আর নয়? দিনের বেলায় কর্তাদের মতন আশেপাশে গির্দে নিয়ে নিদ্রা দেবে না কী ছেলেপুলেরা?

কিন্তু আশ্চর্য! এ বিধি কেবলমাত্র ছেলেদের জন্যেই: মেয়েগুলোর জন্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তার মধ্যে ছিল না কারো।—মেয়েগুলো খেতে পেতো বেলায়। তারপর মা খুড়ি জ্যেঠি পিসিদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাঁদের গজালিগুলো উপভোগ করতো। এবং কেউ কেউ কেটে পড়ে মনের সুখে কাঁচা আম ছ্যাঁচার চটজলদি আচার, কেউ কেউ বা চোরাই করা কুল তেঁতুলের আচার নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতো, সখীদের সঙ্গে পাকা পাকা কথা বলতো। অথবা পুতুলের বাক্স খুলে পুতুল খেলতো।

একটু বড় হওয়াদের অবশ্য মাঝেমাঝেই ধরে বসিয়ে কাঁথা সেলাই, চটের আসন বোনা, কার্পেটে 'ছবি তোলা' ইত্যাদি শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলতো। বলা হতো—'পরের ঘরে যেতে হবে না'?

আমাদের কিন্তু খুব হিংসা হতো ওই মেয়েগুলোর ওপর। ওদের কী মজা! দুপুরে ঘুমের সাধনা করতে হয় না।

এ বাড়িতে স্কুলে ভর্তির হওয়ার রেওয়াজ ছিলো একটু বড় বয়েসেই। 'হাতে খড়ি'র পর বেশ কিছুদিন বাড়িতেই বিদ্যাচর্চা করানো হতো। সে চর্চার ভার ন্যস্ত ছিলো 'গোপাল পণ্ডিতমশাইয়ে'র ওপর। তিনি সকাল সন্ধ্যে দুবেলা একবার করে আসতেন, এবং বাড়ির সবকটা ছেলেকে ঠাকুরদালানের সামনের দালানে পাঠচর্চা করাতেন। নামতা মুখস্থ, হাতের লেখা পাকানো, বানান শিক্ষা-সবই একাধারে তিনিই ম্যানেজ করতেন, গোটা দশ-বারো ছেলের। প্রভাতের বাতাস মুখর হয়ে উঠতো কোরাস গানে—'এককড়া পোয়া গণ্ডা, দুকড়া আধাগণ্ডা, তিনকড়া পৌনে এক গণ্ডা, চার কড়ায় একগণ্ডা।'

এই গণ্ডা পড়বার পাঠটিই আমার বড় প্রিয় ছিলো। না পড়লেও চলে। এক্ষেত্রেও মেয়েদের আসরে এসে বসার সুযোগ

ছিলো না। অবশ্যই এটাও হিংসা উদ্রেককারী। ভাবতাম মেয়ে হয়ে জন্মানোয় কী মজা!

এই মজার সূত্রেই আমার সেই ছোটবোনটা—হ্যাঁ, ছোটবোনের কথাটা আমার শোনা।—শোনা কথাও তো পরে স্মৃতিকথা হয়ে যায় তাই না?

আমার বাবা মারা যাবার সময়, আমার, আমার মার পেটের মধ্যে যে বাচ্চাটা ছিলো, সে জন্মালো মেয়ে হয়ে।

এমনিতেই অজাতশিশুটা সম্পর্কে বাড়িসুদ্ধ সকলের মধ্যেই গড়ে উঠেছিলো একটা বিজাতীয় হিংস্র আক্রোশ। অনবরতই সকলের মুখে মুখে এই কথাটাই ফিরতো, 'কী কালশত্রুই গর্ভে এসে অধিষ্ঠান করেছেন, ভগবানই জানেন। জন্মের আগেই বাপটাকে একেবারে আস্ত গিলে খেলে! এরপর জন্মের পর আবার সংসারের কী সর্বনাশ করে দ্যাখো।'

তবু তখনো কেউ জানতো না সেই অজাত-অদৃশ্য প্রাণীটা কোন শ্রেণীতে পড়বে।—জানি না হয়তো 'ছেলে' হয়ে জন্মালে, এবং সংসারে চটজলদি তেমন কোনো সর্বনাশ না ঘটিয়ে বসলে, ক্রমশ তাকে ক্ষমার যোগ্য করে নেওয়া হতো।

কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, জন্মালো 'মেয়ে' হয়ে।

একেই তো আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, 'মেয়ে' হয়ে জন্মানোটাই যেন কেমন অপরাধ অপরাধ মতো। এমনকি সদ্যোজাত শিশুটি কী 'জাতের' তা উল্লেখ হওয়া মাত্রই সেই মায়েরও প্রতিক্রিয়া হতো দু রকমের।—তখন তো আর ছেলেমেয়েরা হাসপাতালে জন্মাতে যেতো না, আঁতুড়ঘর নামের একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকতো বাড়িতে ওই অজাতদের ভূমিষ্ঠ হবার জন্যে।

ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই পৃথিবীতে এসে পড়ে হতভম্ব হয়ে যাওয়া প্রাণীটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবে এটা অবধারিত, সেই চীৎকার শুনেই আঁতুড়ঘরের উদ্দেশে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ হবে, 'কী হলো? কী হলো?'

আঁতুড়ের ধাই যদি গলা তুলে বলে, 'এই ধাই মাগীর জন্যে পেতলের ঘড়া বার করুন, সোনার নথ বার করুন, অমনি দেখানো হবে না' তখন সারাবাড়িতে একটা আহ্লাদের ঢেউ বয়ে যেতো।

নিশ্চিত যে সেই আহ্লাদের ঢেউটা সদ্যপ্রসূতিকে শত কষ্টের মধ্যে ও জীবনীশক্তি দান করতো।

আর যদি সেই ধাই খ্যানখেনিয়ে বলে উঠতো, 'হয়েছে আর কী। মাটির ঢিপি। বাপ এখন থেকে কোমরের জোর করুন।' তাহলে পুরো বাড়িসুদ্ধ সকলের মুখ অন্ধকার হয়ে যেতো। অবশ্যই সে অন্ধকারের ছায়া সদ্যপ্রসূতির বুকটা অন্ধকার করে দিতো।

কিন্তু আমার সেই ছোট বোনটা কী এই জঙ্গীপুরের চৌধুরী-বাড়ির গোয়ালের পাশের আঁতুড়ঘরটায় জন্মাতে পেরেছিলো? না। সে সৌভাগ্য তার হয়নি। সে জন্মেছিলো আজিমগঞ্জে, তার মামার বাড়িতে। তা সেটা কিন্তু আশ্চর্য নয়। প্রথম দ্বিতীয় সন্তানদের মামার বাড়িতে জন্মানোটাই তো বিধি ছিল। আমিও না কী মামার বাড়িতেই জন্মেছিলাম!

কিন্তু প্রতিপালিত হয়েছিলাম কী সেখানে? তা হইনি। আমাকে খুব আদরে গৌরবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিলো জন্মের কিছুকাল পরে। নামকরণ উৎসবে নাম রাখা হয়েছিলো, গালভরা নামটা।

তবে আমার সেই ছোটবোনটাকে আর আনা হয়নি। সে সেখানেই তার মায়ের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিলো। শুধু এখান থেকে তার নামকরণ হয়েছিলো 'রাক্ষুসী'। জানি না তার আর কোনো নাম ছিলো কিনা। তবে এ বাড়িতে তার নাম উল্লেখের দরকার হলে ওই 'রাক্ষুসী' শব্দটি করা হতো। আর মাঝে মাঝে ঠাকুমা মেজজ্যাঠা আর বড়জ্যেঠির মুখে এও শোনা যেতো 'সর্বনাশী', 'কালনাগিনী', 'বাপখাগী'।

তাকে কেউ চোখে দেখেনি, তবু এসব নামকরণ হতে থাকতো। আমিও তাকে দেখিছি, অনেক বড় বয়েসে। যখন নিজে চরতে শিখে হঠাৎ একদিন বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিলাম আজিমগঞ্জে।

সেই সাড়ে চার বছর বয়স থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত, মাকে একবার দেখবার জন্যে আমার মধ্যে কী আকুলতাই ছিলো। কিন্তু কে আমায় নিয়ে যাবে? আর কোন সাহসেই বা নিয়ে যাবে! যদি যাওয়ামাত্রই সেই বাপখাগী 'সর্বনাশী' ভাইটাকেও চিবিয়ে খেয়ে ফেলে! সে কী আর মেয়ে! সে তো বিষকন্যে!

তা আমি নিজে যাওয়ার পর—আচ্ছা সেকথা থাক। একদা যে সেই একটা গর্হিত কথা বলে ফেলার মহাপাতকে মেজজ্যাঠার কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিলো, তার কারণস্বরূপ দৃশ্যটি আমার দূরবীনের কাচে এতো স্পষ্ট ধরা আছে, মনে পড়লেই স্পষ্ট দেখতে পাই।

বাড়ির বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে।

আর বাড়ির মধ্যে সামনের দালানে দাঁড়িয়ে একগোছা মানুষ। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছেন আমার পিতামহ জগৎনারায়ণ চৌধুরী। আশেপাশে তাঁর সম্প্রদায়। আর তার সামনে অপরাধীর বেশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আজিমগঞ্জের সর্বেশ্বর রায়। আমার বড়মামা।

'বড়মামা' বটে, তবে বয়সে এমন কিছু ভারিক্কি নয়। নিতান্তই তরুণ।

তাঁরই পিছনের দিকে আপাদমস্তক একখানা সাদা চাদরে মোড়া একটি মূর্তি। সেই আবৃত দেহটির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। যেন একটা জড়বস্তু। তবু সেই সাড়ে চার বছরের ছেলেটা বুঝে ফেলেছিলো ওই অদ্ভুত দৃশ্যটি তার মা! যে মায়ের ঘোমটার লালপাড়টা মুছে যাওয়ায় কপালের ওপর সর্বদা এঁকে থাকা মস্তবড় লাল রঙের টিপটা, ছেলেটার কাছে ভীতিকর করে তুলেছিলো 'মা' নামের শব্দটাই। সাধ্যপক্ষে ছেলেটা ক'দিন থেকে সেই 'অপরিচিতার' দিকও ঘেঁষেনি!

তবু বড়মামা মৃদু গলায় বললেন, অতোটুকু শিশু, মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

পিতামহ পাথুরে গলায় বললেন, পারতে হবে! বাপকে ছেড়েও তো থাকতে হচ্ছে!

কথাটা আচমকা শিউরে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তবু সেই সর্বেশ্বর রায় স্থির থেকে বললেন, কিন্তু উনি? ওর এই মনপ্রাণের অবস্থায় ছেলেটাকে ছেড়ে থাকা—

পিতামহ আরো পাথুরে গলায় বলেন, ছেড়ে থাকতে পারবেন না? ওহে বেয়াইয়ের পো! বলি 'পারা না পারা' বলে কোনো কথা সত্যিই সংসারে আছে না কী? নাড়ুর ঠাকুমা থাকতে পারছে না হঠাৎ কর্পূরের মতো উপে যাওয়া কোলের ছেলেটাকে চিতায় তুলে দিয়ে

এসে ? না পারা, ওটা কোনো কথাই নয়। তোমার ভগিনী তো শীঘ্রই আবার কোলে একটি পাবেন। তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে কেটে যাবে। নাড়ু যাবে না! নাড়ু এখানেই থাকবে। নাড়ুকে আমি এ বংশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবো!

হঠাৎ সেই সাদা চাদরে মোড়া জড়বস্তুটা একটু নড়ে উঠলো, আর তার মধ্যে থেকে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পিতামহ বলে উঠলেন, সর্বেশ্বর! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নেই। গাড়িটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। আমি চাই না নাড়ুর সামনে একটা 'নাটক' হোক।

বড়মামাও সঙ্গে সঙ্গে 'ঠিক আছে' বলে হেঁট হয়ে আমার পিতামহকে একটি প্রণাম করে সেই নড়ে ওঠা পুঁটলিটায় কাছে এসে শুধু বললেন, চল্।

বাস! সে আওয়াজ আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হলো না, নিঃশব্দে সর্বেশ্বর রায়ের পিছু পিছু এগিয়ে গেল সেই সাদা পুঁটলিটা।

আর তখনই পিতামহ একটু ক্ষোভ আর ধিক্কারের গলায় বলে উঠলেন, আমার ধারণা ছিলো, যজ্ঞেশ্বর রায় নিজেই আসবেন তাঁর সদ্য বিধবা কন্যাকে নিজ গৃহে নিয়ে যেতে। দেখছি ধারণাটি ভুল। সদ্যবিধবা এবং অন্তঃসত্ত্বা কন্যাকে নিয়ে যেতে একটা দাসীর সঙ্গে একটা বালককে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ভালো। যার যেমন বিবেচনা।

বড়মামা বোধহয় এ অভিযোগের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই মুখটা ফিরিয়ে আস্তে অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, আগেই তো জানিয়েছি, বাবা শয্যাশায়ী। হঠাৎ পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে মাসাবধি বিছানায়।

পিতামহ কী এতে লজ্জিত হলেন? না, তা হলেন না। তিনি সেইরকম কেমন একটা শ্লেষের গলায় বললেন, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।—কোমরের হাড় ভাঙলে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবার একটা অধিকার থাকে। কিন্তু 'পাঁজরের হাড় ভাঙলে'? না তার জন্যে শয্যাশায়ী হওয়ার অধিকার থাকে না।—তা যাক! যজ্ঞেশ্বর রায়কে নিজমুখে জানানো সম্ভব হলো না। তাঁর প্রতিনিধিকেই

জানিয়ে দিই—ওই গর্ভস্থ প্রাণীটা যদি এই বংশের ধারা রক্ষায় কোনো সহায়তা করতে পারে তবেই তার মায়ের আবার এ বাড়িতে ফিরে একটা ঠাঁই হবে। নচেৎ মনে রাখবেন, আর ফেরা হবে না। একদম 'ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন'।—দু দুটো অলক্ষণা রাক্ষসী 'কন্যাকে' সংসারে স্থান দেবার সাহস আমার নেই।

এই কথাগুলি জগৎনারায়ণ চৌধুরী তাঁর কনিষ্ঠ বৈবাহিকের পুত্রের জন্যে তুলে রেখেছিলেন।—অথচ প্রথমে কিছু বলেননি। সর্বেশ্বর রায়ের সঙ্গে আতিথ্যও করেছেন। এবং নিঃশঙ্ক সেই মানুষটার মন যতই খারাপ থাকুক, আগের মতোই বোনের শ্বশুর-বাড়িতে স্নানাহার করেছেন।

তবে অবশ্য এবারে বিশেষ আদরণীয় 'কুটুম্ব'র সমাদরটি জোটেনি। তা তিনি হয়তো সেটা প্রত্যাশাও করেননি।

কিন্তু এখন এই অপ্রত্যাশিত একটা নির্মম আঘাতে তিনি যেন দিশাহারা হয়ে গেলেন প্রথমটা। তারপর হঠাৎ হয়তো বা বয়েসের দুঃসাহসেই জগৎনারায়ণ চৌধুরীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, যে 'জন্মায়নি' তাকে 'রাক্ষসী' বলতে ইচ্ছা হয় বলবেন। কিন্তু যে মেয়ে আজ সাত-আট বছর আপনার সংসারে ঘর করছে, আপনার পৌত্রের মা হয়েছে, সে হঠাৎ—

পিতামহ তীব্র-গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ নিয়ে আমি তোমার মতো একটা অর্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না সর্বেশ্বর। আমার স্পষ্ট কথাটি জানিয়ে রাখলাম। নাড়ু আমার মৃত পুত্রের স্মৃতি, এই চৌধুরী বংশের একজন, অতএব তার ওপর আর কারো দাবি থাকতে পারে না। এবং অবাঞ্ছিত কাউকে সংসারে ঠাঁই দেবারও ইচ্ছে রাখি না।

আর কার কী হয় জানি না, কিন্তু এই নরনারায়ণ চৌধুরীর জীবনে এ ঘটনাটি বরাবর ঘটে এসেছে। একে কী 'অলৌকিক' বলা হবে? ব্যাপারটা এই, সেই 'নাড়ু' নামের বছর পাঁচেকের কাছাকাছি একটা ছেলের সামনে একদা কোনো এক সময়ে তার অবোধ্য যে সব ঘটনা ঘটেছে, এবং তার দুর্বোধ্য যে সব কথা উচ্চারিত হয়েছে, 'নরনারায়ণ চৌধুরী' সেগুলো পরে সব জেনে ফেলেছে, বুঝে ফেলেছে।

এমন কী লাইন বাই লাইন মনেও রেখেছে। এইসব কথা কী করে জেনে ফেলতে পেরেছে নাড়ু পরে নরনারায়ণ হয়ে ওঠার পরে! সেই হয়ে ওঠাটা প্রথম বোধহয় স্কুলের খাতায়।

পাঁচ বছর বয়সে নাড়ুর 'হাতে খড়ি' দেওয়া হয়নি, পিতৃবিয়োগের বছর বলে। 'হাতে খড়ি' দেওয়া হয় সাত বছর বয়সে। এবং তখনই স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু নাড়ু ইত্যবসরে তার জ্যাঠতুতো দাদাদের পড়া শুনে শুনে আর বইগুলো টেনে নিয়ে গড়গড়িয়ে সব-কিছু পড়তে শিখে ফেলেছে। শিখে ফেলেছে নামতা। এবং যুক্তাক্ষরে ঠোক্কর খাচ্ছে না।

সেই তখন থেকেই নাড়ুর চোখের সামনে যেন অন্য একটা জগৎ খুলে গেছে। নাড়ু অনেকদিন অনেকদিন আগের দেখা দৃশ্য আর অনেকদিন অনেকদিন আগের শোনা কথাগুলোর মানে বুঝে ফেলেছে। যা কিছু দুর্বোধ্য ছিলো, তা দিব্যি বোধ্য হয়ে উঠেছে। তাই সেদিনকার কথা তার সব মনে গাঁথা হয়ে গেছলো চিরদিনের মতো।

বড়মামার সেই নিরুপায় ক্ষোভের জ্বলন্ত দৃষ্টিটাই তাকে তখন থেকে সেই 'বড়মামাকে' মনে মনে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। 'আপনজন' ভাবতে শিখিয়েছে। সেই দৃষ্টির অর্থ তার কাছে ধরা পড়েছে।

তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার ওই নাড়ু অথবা নরনারায়ণের কাছে চিরদুর্বোধ্যই রয়ে গেছলো, সে তার পিতামহ জগৎনারায়ণ চৌধুরী।

হ্যাঁ, সত্যিই আমি কোনোদিন আমার পিতামহকে বুঝে উঠতে পারিনি। যদিও ছেলেবেলা থেকেই সংসারসদস্যদের 'চরিত্রপাঠ' ছিলো আমার বলতে পারা যায় সহজাত ক্ষমতা।

কিন্তু ওই জগৎনারায়ণ চৌধুরীর চরিত্রটি—আমার কাছে ছিলো একটি ধাঁধার মতো।

ওই গৌরকান্তি দীর্ঘদেহী সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি কী অনায়াস অবলীলায় নিয়তির মতোই নির্মম হতে পারতেন, হতে পারতেন কী কঠোর কটুভাষী—তা চোখে না দেখলে বোঝবার নয়। হঠাৎ হঠাৎ মনে হতো, মানুষকে অপমান করতে পারাটাই বুঝি ছিলো তাঁর চিত্তের বিলাস। মানুষকে 'মানুষ' বলে গণ্য না করাটাই ছিলো তাঁর দাম্ভিক চরিত্রের একটি বিশেষ চরিতার্থতা।

আর মেয়েমানুষকে ? তাদের বোধহয় বেড়াল কুকুরের থেকে বিশেষ কিছু উচ্চপদ দিতেন না। এমনকি পিতামহী সম্পর্কেও সেই একই মনোভাব। 'মেয়েমানুষ' যেন একটা ঘৃণ্য জীব। নেহাৎ তাদের বাদ দিয়ে সংসার করা যায় না বলেই ধারেকাছে তাদের উপস্থিতি সহ্য করে যাওয়া। প্রতিটি কথায় তাদের সম্পর্কে কী অপরিসীম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব ছিলো জগৎনারায়ণের।

শুধু কী মেয়েমানুষরাই ? বাড়ির শিশুগুলো ? সেও যেন তাঁর কাছে নরকের কীটতুল্য। তাদের ছায়া স্পর্শেও বুঝি তার শুচিতা আর পবিত্রতা ঘায়েল হয়ে যাবে। ছোট ছেলেমেয়েরা হুড়োহুড়ি করে খেলছে, কী হি হি করে হাসছে, এ দেখতে পেলে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যেতো।

অবশ্য দেখতে পাওয়াটা দৈবাৎই হতো। পিতামহ যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন, আমরা ছোটরা হাঁটতাম পা টিপেটিপে, কথা কইতাম ঠোঁটে আঙুল দিয়ে, এবং তাঁর সামনে কোনো কিছু খেতে বাধ্য হলে, সেই খাওয়াটা হতো একদম নিঃশব্দে।

আমরা তাঁর সন্ততিকুলেরা কখনো দেহে তাঁর স্নেহ-করস্পর্শ পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।—অথচ—হ্যাঁ, অথচ তিনি প্রতিদিন সকালে পুজো সেরে উঠেই গোয়ালের ধারে গিয়ে এক একটি গাভী, আর তাদের বৎসদের তাঁরই দেওয়া নামটি ধরে ডেকে ডেকে, গোয়াল থেকে বার করে এনে তাদের গায়ে হাত বুলোতেন, তখন দেখে মনে হতো, শুধু চোখ দুটোতেই নয়, যেন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে স্নেহসুধারা ঝরে পড়ছে। কী কোমল আর স্নিগ্ধ সেই মুখ ! এক একদিন গরুদের জন্যে বরাদ্দ থাকতো, হারানের দোকানের গরম গরম জিলিপি। জানি না সেই দিনগুলো পঞ্জিকায় 'গোসেবার' জন্যে বিশেষভাবে পুণ্যদিন হিসাবে চিহ্নিত থাকতো কিনা ! তবে দেখা যেতো মাঝে মাঝেই হারানের দোকানেরই বাচ্চা চাকর ন্যাপলা একটা বড় চুপড়ি করে এক চুপড়ি রসে টসটসে জিলিপি নিয়ে আসতো, আর পিতামহ নিজে হাতে সেগুলি গরু এবং তস্য বাছুরদের মুখে ধরে ধরে খাওয়াতেন।

আমার এক তুতো দাদা আড়ালে হি-হি করে হেসে বলতো, আমরা

যদি গরু-বাছুর হতুম রে! আহা!

তা আমরা কী আর জিলিপি খেতে পেতাম না? সেকথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। আমরাও পেতাম মাঝে মাঝে, তবে সেটা আসতো —ব্যবস্থা হিসাবে। প্রসাদী নাড়ুর বদলে। হয়তো সেই নাড়ুর ঘাটতি ঘটতো কোনোদিন। সেদিন আমরা মুড়ি-মুড়কির সঙ্গে জিলিপি খেতাম। তবে কী আর গো-বৎস 'রাঙি' 'বুধি' 'সুন্দরীর' মতো গোছা গোছা? আমাদের গোনাগুন্তি।

ন্যাপলা একটু দাঁড়িয়ে থেকে গোসেবা পর্বটি সারা হলে খালি চুপড়িটা নিয়ে ফিরে যেতো। আর যদি বাল্যচাপল্যবশে পায়ের কাছের কাদা গোবর-টোবর এড়াতে একটু নটরাজ নৃত্যের ভঙ্গীতে পা ফেলতো, তো এক ধমকে তার পেটের পিলে চমকে দিতেন পিতামহ।

তা পিলেটিলে ওদের পেটে থাকতোই তখন।

আমরা অবশ্য কেউই প্রত্যক্ষভাবে ওই স্পটে থাকতাম না, গোয়ালের এলাকার ছ্যাঁচা বেড়ার দেয়ালের বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারতাম।— দলের মধ্যে যদিও আমিই ছিলাম সব থেকে ছোট, তবু কেন কে জানে ক্ষ্যামাঘেন্না করে আমায় দলে নিতো। এবং আমার সঙ্গে কথাও কইতো সমযোগ্য হিসাবেই। তো—দেখে দেখে চাঁপাদি চুপিচুপি বলতো, দেখেছিস নাড়ু, ঠাকুর্দার ব্যাভার? ন্যাপলা বেচারীকে শুধু খালি চুপড়িটা ফেরৎ দিলো, একখানা মাত্তরও জিলিপি দিলো না! কী নিম্নায়িক, যত মায়া গরু-বাছুরের ওপর।

এ হেন দুঃসাহসিক মন্তব্য যদি পিতামহর কানে পেঁছাত, কী ঘটনা ঘটতো বলা যায় না। তবে কানে পেঁছনোর প্রশ্ন ছিলো না। কার এতো সাহস আছে, এ হেন কথা ওর সামনে উচ্চারণ করবে? তা সে অতিবড় শত্তুরকে বকুনি খাওয়াবার জন্যেও সম্ভব নয়।

নির্মায়িক।

এইটাই ওর একটি প্রধান বিশেষণ।

এই বিশেষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই 'নারায়ণ' বাড়িরই এক ব্যক্তি। যিনি নাকি সম্পর্কে আমার সেজজ্যাঠা।

তবে সেজজ্যাঠাকে শুধু আমি কেন, আমরা কেউই দেখিনি। বড়জ্যাঠামশাইয়ের বড় মেয়ে দুর্গাদিই শুধু দেখেছে, এবং শৈশবের

অস্ফুট চেতনায় একটা ইতিহাস মনে রেখেছে, তার কাছেই শোনা।

বড়জ্যাঠা নিত্যনারায়ণ এবং মেজছেলে সত্যনারায়ণের পর, এবং আমার বাবা মৃত ধ্রুবনারায়ণের মাঝখানে ছিলেন আর এক 'নারায়ণ', অনন্তনারায়ণ। কিন্তু জঙ্গীপুরের এই চৌধুরীবাড়ির দরজা তাঁর মুখের ওপর চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

কী তার কারণ?

সেবার শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে অনেকদিন এখানে ছিলো দুর্গাদি, আর অনেকদিন থাকার সুযোগে অনেক ভাব হয়ে গিয়েছিলো। দুর্গাদি তখন কেবলই হাই তুলতো, আর যেখানে সেখানে শুয়ে পড়তো। আর যাকে পেতো ডেকে ডেকে বলতো, এই, গোলোকধাম খেলবি?

আমি ছাড়া ছেলের অনেকেরই ইস্কুল, শুধু এই নাড়ুরই সে বালাই নেই তখন। রানীদি গৌরীদি নিভাদি ছোড়দি রাঙাদির দলে দিব্যি ঢুকে পড়তাম। অবশ্যই পিতামহর অনুপস্থিতিতে। ছেলেদেরকে মেয়েমহলে দেখলে রক্ষে থাকতো না।

পিসি দেখতে পেলেই বলতো, এই নাড়ু, আবার অন্দরমহলে ঢুকে এসে মেয়েলি গল্প গিলছিস? কাকা দেখলে রক্ষে রাখবেন? —(যদিও নাড়ুর বয়েস তখন ছয়-সাত)

'কাকা' অর্থে ওই আমার পিতামহ। পিসি তাঁর বালবিধবা ভাইঝি। তাও বোধহয় ঠিক 'নিকট' নয়, জ্ঞাতি গোছের। তাঁর নিকট নিজজন কেউ না থাকাতেই এখানে অবস্থান। অথচ বলতে গেলে ওনার ওপরই সংসার।—কাকার বিশেষ আস্থাভাজন তিনি।—তা নইলে—এ সংসারে আশ্রিতের সংখ্যা তো কম নয়? সবাইকেই কী আর জগৎনারায়ণ মনে রেখেছেন?—একদা তাদের অসহায় অবস্থা দেখে নিজসংসারে এনে ভর্তি করে ফেলেছেন, ব্যস। ওই পর্যন্ত। এখানটা দেখলে একবার থমকে দাঁড়াতে হয়। একটা নির্মায়িক লোকের গৃহে এতোগুলো 'অসহায়' এসে আশ্রয়লাভ করে কোন সূত্রে?

পরে একদা একদিন সর্বেশ্বর রায় নামের লোকটা অনায়াস গলায় বলেছিলেন, 'কিসের সূত্রে আবার? দাম্ভিকতার সূত্রে। নিজেকে

উঁচুতে স্থাপন করার আত্মপ্রসাদ। আমি তো বাবা এই সার বুঝে ফেলেছি।—'আমি এতোজনের আশ্রয়দাতা অন্নদাতা, এতোজনের প্রতিপালক'—এই মহিমা!'

জানি না, এটাই সত্যি কিনা। অথবা—পুরনো রাগের ঝালঝাড়া।

পিসি আমায় ভারী ভালোবাসতো, তাই পাছে আমি লাঞ্ছিত হই তাই সামলাতে আসতো। কিন্তু আমি রেগে রেগে বলতাম, যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। 'জগু ছাড়ে কেন?' আমি যেন গরুছাগল! তাই বেঁধে রাখতে হবে!

গরুছাগল কী মশামাছি, টের পাবি এরপর। বলে চলে যেতো পিসি। তবে ঠিক জানতাম, তিনি তাঁর কাকার সাড়া পেলেই আগে আমায় সামলাবেন।

সেটা হচ্ছে এই রান্নাঘরের পিছনের লাউ-কুমড়োর বাগানের মধ্যে দিয়ে একেবারে সেই ঠাকুরদালানের চাতালে পৌঁছে দেওয়া। যেটা 'ছেলেমহল'। যেটা সদর।

অতএব নিশ্চিন্ত চিত্তে মেয়েলি গল্প গিলে চলি।

সেই আসরেই একদিন জানা গেল, সেজজ্যাঠা তাঁর বাবার 'তেজ্যপুত্তুর'।—এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙানো তাঁর বারণ। কারণ এই —পিতামহ নাকি কোনো এক মহাকুলিন গরীব বামুনের কন্যাদায় দেখে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে আপনার কন্যা আমার গৃহে যাবে।'—

তা অমনি তো যাবে না? কারো সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যাবে তো? ঘরে তো দু-দুটি পুত্রবধূ এসেই গেছে। অতএব তৃতীয় জনকেই সে সে ভার নিতে হয়।

কিন্তু অনন্তনারায়ণ নাকি বলে উঠেছিলেন, অসম্ভব!

একেবারে অ-সম্ভব! তা কারণটা কী জানতে পারি?

সেজজ্যাঠা না কী বলেছিলো, সে বিয়ে-টিয়ে করতে চায় না, দেশের কাজ করতে চায়। তাতে তার বাবা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, দেশের কাজ করতে হলে বিয়ে করা বারণ, এ কথা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে?—মহাত্মা গান্ধী বিয়ে করেননি? পণ্ডিত

মতিলাল ? জহরলাল নেহরু ? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ? রামমোহন, বিদ্যাসাগর ? এমন কী তোমাদের রবিঠাকুরও—

ছেলে ফস করে বলে বসেছিলো, বাবা, এ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না ! সকলের মানসিকতা এক নয় ।

শুনে বাপও ফস করে আগুনের মতো জ্বলে উঠে বলেছিলেন, তর্ক ? তোমার সঙ্গে আমি তর্কে নামছি, এটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে কি করে ? জগৎনারায়ণ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না ! আমার হুকুম বিয়েটা তোমাকে করতে হবে । কারণ ভদ্রলোককে আমি কথা দিয়েছি ।

ছেলে তবু দুঃসাহস দেখিয়ে বলে বসেছিল, 'কথা দেবার' আগে আমায় একবার জানানোও দরকার মনে করলেন না ?

কী ? কী বললে অনন্ত ? জগৎনারায়ণ তার সিদ্ধান্ত নেবে অন্যের মতামতের উপর নির্ভর করে ? তোমার স্পর্ধাটা দেখছি আকাশ ছুঁচ্ছে । আমার হুকুম, বিয়েটা তোমায় করতেই হবে । মাথা থেকে বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলো ।

আমায় মাপ করবেন বাবা !

শুনে নাকি জগৎনারায়ণ প্রথমটা পাথর হয়ে গিয়েছিলেন আর তারপর আগুন । সেই আগুনঝরা গলায় বলেছিলেন, ঠিক আছে । আজ থেকে জানবো দুটি বিবাহিত পুত্র ও একটি নাবালক পুত্র ব্যতীত আমার আর কোনো পুত্র নেই । ভুলক্রমেই ব্রাহ্মণকে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম ।

এসময় নাকি পিতামহী একবার ডুকরে উঠেছিলেন ! কিন্তু প্রচণ্ড এক ধমকে একদম চুপ হয়ে গিয়েছিলেন ।

তবে পিসি নাকি কেঁদে উঠে বলেছিল, ওরে হতভাগা ছেলে, এখনো সময় আছে । বাপের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বল, আপনি যা বলবেন শুনবো !

ছেলে নাকি একটু হেসে বলেছিল, তাহলে তো প্রকারান্তরে প্রমাণিত হয়ে যায়, এই অনন্তনারায়ণ চৌধুরী জগৎনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র নয় । সেটা নিশ্চয় চাও না ? যেখানেই থাকি, পরিচয়টা হারালে চলবে না ।

তার মানে তিনিও 'বাপকা বেটা'।

অস্নাত অভুক্ত অনন্তনারায়ণ সেইদিনই মাত্র দু-একটি জামাকাপড় সম্বল করে জঙ্গীপুরের সেই চৌধুরীবাড়ি থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিলেন। তদবধি আর কোনো সংস্রব নেই।

চলে যাবার সময় নাকি কেবলমাত্র পিতামহীকে প্রণাম করে গিয়েছিলেন। আর কাউকে নয়, এমনকি গৃহদেবতা জনার্দনকেও নয়। মা বলেছিলেন, 'তুই আমায় মেরে রেখে গেলি না কেন অনন্ত? তাহলে আমি বেঁচে যেতাম।'

আর তাই শুনে তাঁর ছেলে নাকি বলেছিল, 'এতো সহজে বেঁচে যাবে? তাও কী হয়? এখনো কত কী তোলা আছে তোমার ভাগ্যে। এই মহান বাড়ির বৌ হয়ে এসেছ!'

এসব পিসির জবানিতে শোনা। পিসি নাকি তবু বলেছিল, ওরে মতিচ্ছন্ন ছেলে, একবার ঠাকুরঘরে প্রণাম করে যা!

মতিচ্ছন্ন ছেলে বলেছিল, 'আমার ঠাকুর ঘরে বন্দী থাকেন না। তিনি বিশ্বময় ছড়িয়ে আছেন।'—

করেননি প্রণাম!

এ সব কথা ঠিক একদিনেও শোনা নয়। দুর্গাদির আসরে প্রথম ইতিহাস উন্মোচন, তারপর টুকটাক এর-ওর কাছে। অবশ্য সবই চুপিচুপি!

তদবধি আর সে বাড়িতে অনন্তনারায়ণের নাম উচ্চারিত হতে পায়নি। যেন অনন্তনারায়ণ নামে কেউ কোনোদিন সত্যিই ছিলো না। কবে বুঝি বড়জ্যাঠার বড়ছেলে বলেছিলো, 'সেজকাকার বইতে হাত দিচ্ছিস যে?' কথাটা শুনতে পেয়ে জগৎনারায়ণ অবাক গলায় বলেছিলেন, 'সেজকাকা? তাকে আবার কোথা থেকে আবিষ্কার করছ? তোমাদের তো দুটিই কাকা। মেজকাকা আর ছোটকাকা!'

আর কবে যেন কোন এক দুর্গাষষ্ঠীর দিন, পিতামহী ছেলে-পুলেকে 'ষাটের জল' দিতে দিতে কেঁদে উঠে বলেছিলেন, ছেলেটা চিরতরে গৃহত্যাগী দেশত্যাগী হয়ে গেল! এই করলেন আমার মা দুর্গা!

সেটাও শুনতে পেয়ে পিতামহ বলেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

দাও, অল্পে রেহাই পাওয়া গেছে। শাস্ত্রে আছে 'দুর্বিনীত পুত্র সর্পতুল্য'! তেমন পুত্রকে নিয়ে বসবাস সর্পগৃহে বাসতুল্য!'

না, তদবধি নিজে তিনি একদিনের জন্যেও ভুলে ভুলেও বলে ফেলেননি তাঁর চারটি পুত্র। নতুন কোনো অভ্যাগতকে জানিয়েছেন, তিনটি কন্যা, তিনটি পুত্র। কন্যাদের বিবাহ হয়ে গেছে, দুটি পুত্র বিবাহিত, একটিই এখনো বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হয়নি।

তারপর অবশ্য হয়েছে সে প্রাপ্তিযোগ। তা নইলে আর 'নাড়ু' এলো কোন সূত্রে?—

অথচ এই মানুষই শেষ রাত্রিতে ঘুম থেকে উঠে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুজোর ঘরে বসে থাকতেন গৃহদেবতা 'জনার্দন' নামক এক শিলাখণ্ডর সামনে। তখন তাঁর মুদ্রিত চোখের কোল বেয়ে গালের ওপর জল গড়িয়ে পড়তো অবিরল ধারায়। মুখে ফুটে উঠতো একটি দিব্যভাব।

সেই পিঠ খাড়া করে স্থির হয়ে পদ্মাসন হয়ে বসে থাকা নিষ্কম্প শরীরটাকে দেখলে মনে হতে যেন একটা ধাতুমূর্তি। নড়তে পারে না, নিঃশ্বাস পড়ে না।

ঠাকুরঘরের দরজাটা ভেজানো থাকতো, কিন্তু আমাদের পক্ষে দেখবার একটা জায়গা ছিলো, সেটা হচ্ছে ঘরের একধারের দেওয়ালের কয়েকটা ঘুলঘুলি।

এই ঘুলঘুলি কটা কেন ওখানে রাখা হয়েছিলো জানি না, তবে দেখতাম ওই দেওয়ালটার ধারেই ঝকঝকে করে মাজা লম্বা পিলসুজের ওপর তেমনি ঝকঝকে একটা পেতলের প্রদীপ জ্বলতো ঘিয়ে ডোবানো সলতেয়।—আর সন্ধ্যা-আরতির সময় ধুনুচিটা বসানো থাকতো তার পাশে;—তখন অবশ্য আমাদের ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকিমারা সম্ভব হতো না, কারণ ঘুলঘুলির গহ্বর দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতো গলগল করে।—এইজন্যেই কী ওগুলোর দরকার ছিল? দেওয়ালটার অনেকখানি কালো হয়ে গিয়েছিলো।

তবে সন্ধ্যা-আরতির সময় উঁকিঝুঁকি মারার কথা ওঠে না। তখন বাড়ির প্রতিটি প্রাণীকে তো ঠাকুরঘরের সামনের দালানে জড়ো হতেই হবে। এবং হবে কাচা কাপড়জামায় আবৃত হয়ে ধোয়া হাতে-পায়ে।

কারণ তখন সবাইকে আরতি অন্তে 'শান্তিজল' নিতে হবে।

সন্ধ্যা-আরতির সময় বাজতো ঘড়ি ঘণ্টা কাঁসর। তা ঘণ্টাটা তো স্বয়ং জগৎনারায়ণের বাম করতলে। তবে ওই ঘড়ি এবং কাঁসর নামের জিনিস দুটিকে পেটাবার দুর্লভ অধিকারটি জুটতো এক-একদিন এক একটা ছেলের ভাগ্যে। মেয়েদের? নৈব নৈব চ। তবে তাদের ভাগ্যে শাঁখ বাজানোটা জুটতো।

আমার নিতান্ত আকুলতায় একদিন কাঁসরখানা হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু আর কোনোদিন নয়। এলোমেলো পেটাবার ফলে নাকি 'তালভঙ্গ' দোষ ঘটে পিতামহকে আরতিকালে চঞ্চল করে তুলেছিলো।

আরতির পর ঠাকুরের ভোগরাগ।

প্রকাণ্ড একটা শ্বেতপাথরের থালার ওপর সাজিয়ে নিয়ে বয়ে আনতো পিসি, প্রচুর পরিমাণে কাটা ফল, ছানা, চিনি, মুগের ডাল ভিজে, এবং দুটি বাটিতে ক্ষীর ও দৈ!

এই ভোগের প্রসাদটিই গৃহকর্তার সাত্ত্বিক রাত্রির আহার।

আহারান্তে একটু হর্তুকি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়তেন। এবং ঘুম ভেঙে উঠে পড়তেন রাত্রি চারটের সময়।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, সে সময় উঠেই প্রাতঃকৃত্য সেরে কুয়ো থেকে জল তুলে মাথায় ঢেলে দিনের প্রথম স্নানটি সেরে পট্টবস্ত্র পরে পুজোয় বসতেন। দ্বিতীয় স্নানটি হতো দুপুরে খাওয়ার আগে ঘাটবাঁধানো বড় পুকুরে—অবগাহন—স্নান। তার আগে চলতো তেলমাখা পর্ব। তাঁর সেই খাঁটি সরষের তেলরঙা দেহে দৈনিক এক বাটি করে ঘানিতে পেষাই সরষের তেল 'খাওয়ানো' হতো। সেই খাওয়ানোর জন্যে লোক থাকতো আলাদা।

সে যাক। সে তো দুপুরে। ওই ভোরবেলায় কূপ-জলেই।

সেই ভোরের সময়ও একটি আরতি হতো, তার নাম 'মঙ্গল আরতি'। যে আরতিতে আর কোনো বাদ্যধ্বনি থাকতো না, শুধুই ঘণ্টাধ্বনি। সেই মৃদুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি চেতনায় এসে পৌঁছতো ঘুমের অতলতল থেকে। মনে হতো এ ধ্বনি যেন এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে থেকে আসছে না, আসছে আকাশপথ বেয়ে।

সে ধ্বনির রেশ মিলিয়ে যাবার পর আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। এবং সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে কাচা জামাকাপড় পরে ঠাকুরঘরের পাশের দিকের দালানে গিয়ে ঘুলঘুলিতে চোখ ফেলে দেখতে পাওয়া যেতো তখনো ঠায় বসে আছেন একাসনে পদ্মাসনে। মুখে দিব্যদ্যুতি, হয়তো চোখের কোণায় জল।

খানিক খানিক পরেই কেউ একবার করে সরেজমিনে তদন্ত করে আসতো উঠেছেন কিনা, নড়ছেন কিনা। ওনার ওঠার ওপরেই যে আমাদের মানে এই ছোটদের জীবনমরণ নির্ভর।

পিতামহ দরজা খুলে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তো প্রসাদের থালাটিকে বার করে আনা যাবে না। অথচ প্রথম প্রাতরাশের আগে 'ঠাকুরের পেসাদ' মুখে না দিয়ে তো অন্য কিছু মুখে দেওয়া চলবে না।

তা সে চিরতার জলই হোক আর আদা-ছোলাই হোক!

অতএব আমাদের ব্যবস্থা প্রাতরাশ সামনে নিয়ে উঠোনে পাতা সেই বৃহৎ চৌকিটায় বসে অধীর প্রতীক্ষা!—অবশ্য নীরবে নয়। জগতে যে বিনা পারিশ্রমিকে কিছুই মেলে না, সেই শিক্ষা দিতেই বোধহয় সমবেত কণ্ঠে 'স্তোত্র পাঠ' চালাতে হতো ততক্ষণ।

চারটে স্তোত্র ছিলো নির্ধারিত। দুটো বাংলো, দুটো সংস্কৃত। সংস্কৃত দুটি হচ্ছে 'প্রভুমীশমনীশমশেষ গুণম' ও 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে'।

অর্থাৎ শিববন্দনা আর গঙ্গাবন্দনা।

আর বাংলা দুটি?

প্রথমটি হচ্ছে গুরুর কাছে কাতর আকুতি। 'ভবসাগরতারণ কারণ হে! রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন হে—' অনুপ্রাসের অপূর্ব বাহাদুরী দেখিয়ে দেখিয়ে, শেষে একবার করে ধুয়ো—'গুরুদেব দয়া করো দীনজনে।'

বাংলা হলেও তাতে স্তোত্রের ঝংকার সংস্কৃতের মতো। দ্বিতীয়টি নেহাতই সাদামাঠা, ঝংকারহীন। শুরু হয়েছে এইভাবে—'এসো দেব দয়াময় পতিত-পাবন! পাতিয়া রেখেছি প্রভু হৃদয় আসন'।—অতঃপর 'সংসারের কোলাহলে ছিলাম তোমায় ভুলে, দয়া করে দেখা

দাও—দুঃখনিবারণ। অধমে কৃতার্থ করো অধমতারণ।'

সমবেত কণ্ঠে। তবু কণ্ঠস্বর 'সমে' রাখতে হতো। কারণ উচ্চকিত স্বর যেন ঠাকুরঘর পর্যন্ত পৌঁছে পিতামহর ধ্যানভঙ্গ ঘটিয়ে বসে।

এক একদিন সেই 'ধ্যান' এমন জম্পেশ হতো যে আমাদের আবার স্তোত্রগুলি 'রিপিট' করতেও হতো। সে বড় করুণ অবস্থা।

আর সকলের মধ্যে আমি একটু বাক্যবিন্যাসে বেপরোয়া ছিলাম। হয়তো আমার সম্পর্কে সকলেরই অন্তর্নিহিত একটু প্রশ্রয় ছিলো।—ছেলেটার বাপ নেই, মা থেকেও নেই! আপন ভাইবোন বলতেও কেউ নেই। যেন মাঠের মাঝখানে একটা নিঃসঙ্গ ন্যাড়া তালগাছ। তা তাকে একটু স্নেহস্পর্শ দিতেই হয়। সেই প্রশ্রয়েই আমি একদিন পিতামহীকে প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা ঠাকুমা, রোজ রোজ 'পতিত-পাবন দয়া করো, পতিতপাবন দয়া করো' বলতে হয় কেন আমাদের? 'পতিত' মানে তো পাপী। আমরা কী পাপী?

ঠাকুমা তাড়াতাড়ি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলেন, এই, খবরদার। ঠাকুর্দার সামনে যেন বলে বসিসনি এ কথা।

তা তুমি যদি উত্তরটা না দাও, ঠাকুর্দাকেই বলবো।

এটা আমার চালাকি। ঠাকুমার ওই সর্বদা ভীতভাব দেখলেই আরো ভয় দেখাতে ইচ্ছে করতো আমার।

ঠাকুমা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে ওঠেন, সুষমা, শুনছিস ছেলের কথা!

সুষমা অর্থাৎ পিসি, তিনিই ঠাকুমার বল-বুদ্ধি-ভরসা। নিজের মেয়েরা তো যে যার শ্বশুরবাড়িতে। মেয়েদের ঘনঘন বাপের বাড়ি আসা পছন্দ করতেন না ঠাকুর্দা। 'সুষমাই' যেদিকে জল পড়ে সেদিকে ছাতা ধরে।

তো সুষমা শুনে একটু দুঃখের হাসি হেসে বলে উঠেছিলেন, সর্বদাই শুনছি আর দেখছি খুড়ি। ভয় হয় বংশে আর একখানি না দোত্যিকুলে পেল্লাদ 'অনন্তনারায়ণ' দেখা দেয়।

খুড়ি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভয় আমারও হয়। হঠাৎ হঠাৎ দেখি ঠিক তেমনি চালচলন। কথাবার্তার ধরনধারণ!

কিন্তু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে উঠলেই হলো! 'জগৎনারায়ণ' নামক এক অমোঘ শক্তি সেই হতভাগা নাড়ুটাকে তাঁর পরিকল্পিত ছাঁচে গড়ে তোলবার জন্যে 'স্পেশাল কেয়ার' নিচ্ছেন না? বাড়ির অন্যসব ছেলেদের মধ্যে চরে বেড়ালেও, আমার ওপর খবরদারি আর নজরদারির মাত্রাটা যে 'বিশেষ' তা সেই বয়সেই টের পেতাম, আর নিজেকে যেন কেমন বন্ধনদশাগ্রস্ত বলে মনে হতো।

এর ওপর এলো উপনয়ন-পর্ব।

আমার যখন মাত্র ন বছরে পদার্পণ, তখন আমার 'পৈতে' দেওয়া হলো। আমার মাথাভর্তি কোঁকড়া প্যাটার্নের চুলগুলোকে সমূলে বিসর্জন দিতে হলো। সত্যি বলতে, চুলগুলো যখন মাটিতে স্তূপ হয়ে হয়ে পড়তে লাগলো, আমি যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এগুলো এতোদিন আমার শরীরের সঙ্গে ছিলো? এগুলো আমার মায়ের দেখা, আমার সেই কর্পূরের মতো উপে যাওয়া বাবারও দেখা? ওগুলো আর রইল না।

এর আগে আমার মেজজ্যাঠার ছেলের পৈতে হওয়া দেখেছি। তখন তো কই তার কেটে পড়ে থাকা চুলগুলো দেখে এমন অনুভূতি আসেনি। মেজজ্যাঠার ছেলের অবশ্য আরো বড় হয়ে পৈতে হয়েছিলো। বোধহয় তেরো বছর বয়সে! তা ওর তো মাথায় এতো চুল ছিলো না। পড়ুয়া ছেলেদের উপযুক্ত কদমছাঁট চুল।

বাড়িতে নাপিত আসতো, জগুদার তত্ত্বাবধানে ছেলেদের চুলছাঁটা নোখকাটার কাজ সমাধা হতো। আর জগুদা তো ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। পিতামহর নির্দেশ ছিলো কারো যেন টেরি বাগাবার মতো কেশকলাপ না থাকে। জগুদা নাপিতকে নির্দেশ দিতো, 'সামনে পেছনে সমান ছাঁট দিয়ে দাও হে পরামানিক ভায়া। যাতে মাথায় উকুন খুসকি বাসা বাঁধতে না পারে।'

কিন্তু আমার?

আমার জন্যে নাকি পিতামহীর কোথায় কোন দেবীর কাছে মানত ছিলো। পৈতের আগে নাপিতের কাঁচির নীচে মাথা সমর্পণ চলবে না।—একেবারে মস্তকমুণ্ডন ঘটলে, সেই কেশরাজিকে জমা দিয়ে দেবীর কাছে পুজো দেওয়া হবে।

তা নেহাত মেয়েদের মতো লম্বা চুল হয়ে যাবার ফলে ভয়ে পিসি মাঝে মাঝে একখানা কাঁচি নিয়ে আমার চুলের আগাগুলো ছেঁটে দিতো। হয়তো—এইজন্যেই আমার চুল সম্পর্কে অমন একটা অনুভূতি। যাক, বালাই চুকলো।

মুণ্ডিতমস্তক বালক-সন্ন্যাসী নরনারায়ণ চৌধুরীকে উপনয়নের রীতি অনুযায়ী ভিক্ষাগ্রহণের পরই 'দণ্ডি' হস্তে একটা আলোবাতাস-হীন ঘরে ঢুকে পড়তে হলো। যে ঘরে সূর্যের আলোর প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশ নিষেধ নারীজাতির ছায়াটুকুও।

কাঠের ধোঁয়ায় চোখ লাল করে দৈনিক একবার স্বপাক হবিষ্যান্ন, বাকি সারাটা দিনরাত ফলমূলের ওপর নির্ভর।

আমার ওই 'স্বপাকের' সাহায্যার্থে ছোড়দা অর্থাৎ মেজজ্যাঠার মেজছেলে এ ঘরে প্রবেশ-অধিকার পেতো। অবশ্য সদ্যস্নান করে এবং পট্টবস্ত্র পরে। তবে তার অভিজ্ঞতা ছিলো বলেই কোনোমতে তিনটি দিন উতরে গেল।

তিন দিন পরে দণ্ডি ভাসানো। পরদিন প্রচুর লোকজনও নেমন্তন্ন খেলো বাড়িতে। শুনতে পেয়েছিলাম আমার মামার বাড়িতেও নাকি নেমন্তন্ন করে পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু কেউ আসেনি। শুধু একজন ব্রাহ্মণ মারফত সদ্য সন্ন্যাসীর জন্যে 'ভিক্ষা' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। নতুন পেতলের সরায় এক সরা চাল, একটি পৈতে, একটি হর্তুকি আর একখানি 'ফুল গিনি'! এবং নতুন ধুতি-চাদর।

তো সেসব নাকি পিতামহ পত্রপাঠ ফেরত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বকলমে কাজ সারার মধ্যে যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এই 'ভিক্ষা' গ্রহণ করা যায় না।'

যাক, আমার আর তাতে কী! গিনি নিয়েই বা আমি কী করতাম, আর চালটালই বা কী করতাম!

নেমন্তন্ন যে করা হয়েছে সেটাও তো জানা ছিলো না যে, বিশেষ একটি 'প্রত্যাশায়' রোমাঞ্চিত হবো? সব খবরই শুনেছি পরে।

যাক—

শুরু হলো আমার জীবনের শিক্ষা।

পৈতে হলে এক বছর নিরামিষ খেতে হয় এবং পিসি, নতুন ঠাকুমাদের মতো একাদশী করতে হয়, তা জানা ছিলো। তবে 'স্বপাকটা' যে বহাল থাকবে, সেটা জানা ছিলো না।

শুনে ঠাকুমা নাকি কেঁদেকেটে পিসিকে এগিয়ে দিয়েছেন নির্দেশদাতার কাছে আর্জি জানাতে। পিসিই যা সাহস করে একটু কথা বলতে পারে। তাই সব ব্যাপারে ওকেই বাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। বললো, ওই দুধের বালকটাকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন কাকা! ও কী পারবে?

কাকা বললেন, তোমাদের মতো স্নেহময়ীদের 'আহা আহা'র বাড়াবাড়ির মধ্যে থাকলে হয়তো না পারতে পারে! নইলে না পারার কিছু নেই! সেকালে পঞ্চম বর্ষীয় বালকও গুরুগৃহে বাস করতে যেতো। ওকে তোমরা তোমাদের আওতা থেকে মুক্ত করে আমার হাতে ছেড়ে দাও দিকি। আমার মতো করে মানুষ করতে দাও।

'পিসি' বলেই এতোগুলো কথা বললেন। ঠাকুমা বা আর কেউ হলে অবজ্ঞা প্রদর্শনেই কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন।

অতঃপর আর কী?

নাড়ু নামের ছেলেটার মস্ত একটা প্রমোশন ঘটে গিয়ে তাকে একখানি 'মিনি' জগৎনারায়ণ চৌধুরীতে পর্যবসিত হতে হলো।

আমার শোবার ব্যবস্থা হলো পিতামহর ঘরেরই একপ্রান্তে আলাদা একটি চৌকিতে। তাতে তোশক নয়, শুধু একটা শতরঞ্চি ও চাদর পাতা। এবং বালিশেরও বাহুল্য সংখ্যা রইলো না।—মাত্র একটি মাথার বালিশ। অথচ ছেলেদের জন্যে বরাবরই পাশবালিশের ব্যবস্থা ছিলো ('মেয়েদের' জন্যে অবশ্যই নয়)।

কিন্তু বাহুল্যকে বর্জন করতে শেখাই তো শিক্ষা।

ঘুম ভেঙে উঠতে হতো পিতামহর সঙ্গেই ব্রাহ্ম মুহূর্তেরও আগে। তবে পিতামহর মতো তখন স্নানটা করতে হতো না এই যা।—ঘুমে শরীর লটপট করলেও পিতামহ যেদিন জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, নরনারায়ণ! তোমাকে কি প্রতিদিনই দু'দফা ডেকে

তবে ঘুম ভাঙাতে হবে ?—তার পরদিন থেকেই নিজে উঠে পড়তাম পিতামহর ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই।

উঠে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেজে, হাতমুখ ধুয়ে রাতের ধুতি-জামা ছেড়ে, একটি ছোটখাটো পট্টবস্ত্র পরে নিতাম। গা ঢাকতাম একটি উড়ুনিতে। তারপর পিতামহর সঙ্গে 'জনার্দনের' ঘরে গিয়ে একপ্রান্তে একটি আসন পেতে ধ্যানে বসে পড়া। যতক্ষণ পিতামহ বসে থাকবেন, ততক্ষণ।

উপনয়নের পর থেকে ঠাকুর্দা আমায় আর বাড়ির আর সব ছেলেদের সঙ্গে স্তোত্র পাঠ করতেও দেননি! আমার জন্যে আলাদা কিছু স্তোত্র নির্বাচন করা হয়েছিলো, যার সবই সংস্কৃত। আমাকে তার নির্ভুল উচ্চারণে দুরস্ত করতেন পিতামহ। সেসব আর এখন কিছুই মনে নেই। কারণ পিতামহর যত্নকৃত বাগানে বেশীদিন ফুল ফোটবার সুযোগ ঘটেনি।

সে যাক। তখন আমি স্পেশাল কেয়ারে। অর্থাৎ আমাকে আমার তুতো দাদা-দিদিদের দল থেকে একদম বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছিলো। অতএব আমার মধ্যে একটি ভাব সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিলো। ওরা সবাই একটু নীচু শ্রেণীর, আমি ওদের থেকে উঁচু শ্রেণীর। আমি জগৎনারায়ণের শ্রেণীতে। আমি স্নান করতে যাই তাঁর সঙ্গেই দীঘিতে। এবং স্নানের সময় বহুবিধ মন্ত্র আওড়াই। আমি ভাত খেতে বসি তাঁর সঙ্গে আলাদা। সে ভাত রান্না হয় দুজনেরই স্বপাকে। ঠাকুরদালানের পাশে যে ভোগঘর আছে তারই সামনে দালানে সেই রন্ধনব্যবস্থা।

কী ভাগ্যিস, গোছগাছগুলো করে দেবার অধিকার পিসিকে দেওয়া হতো। পিসি দুটো উনুন জেলে দিতো, কাঠ গুছিয়ে রাখতো। আতপ চাল ধুয়ে রাখতো ছোটবড় দুটো পাত্রে। দু ড্যালা মটরডাল বাটা, এবং আলু কাঁচকলা ইত্যাদি আনাজ ধুয়ে রাখতো পাশে।—বাড়ির গরুর দুধ থেকে তৈরী গাওয়া ঘিয়ের শিশি ও সৈন্ধব লবণের পাত্রটি রেখে দিতো পাশে, এবং আমরা যতক্ষণ খেতাম দূরে বসে নিঃশব্দে পাখা নেড়ে যেতো, কথা কইতো না। পাছে আমিও কথা বলে ফেলি। কথা কয়ে ফেললেই তো 'খাওয়া নষ্ট'। সারাদিন শুধু

ফলমূলেই ভরসা হবে।

ভাত বেড়ে নিয়ে যখন খেতে বসা হতো, তখন মনে মনে যে একটি গৌরব অনুভব করতাম, তাতেই সমস্ত ক্লেশ-কষ্ট কমে যেতো।

পিতামহর কাছাকাছিই তাঁরই মতো একখানি কার্পেটের আসন পাতা হতো আমার জন্যে। দুজনেরই দবি-ধবধবে জয়পুরী শ্বেতপাথরের থালা-বাটি-গেলাস। শুধু মাপেরই যা তারতম্য। ঠাকুর্দারটা প্রকাণ্ড, আমারটা ছোট।

ভাতের সঙ্গে অবশ্য ভালো জিনিসও জুটতো বৈকি! বাটিভর্তি ঘন সরপড়া দুধ অথবা জ্বাল দিয়ে মেরে ক্ষীর। পাকা মর্তমান কলা, আমের সময় সেরা গাছের আম, ঘরে পাতা দৈ ইত্যাদি। মাঝে মাঝে একটু সুযোগ পেলেই বাদলাদা টোপাই রাখু বলতো, বেশ আছিস বাবা। দিব্যি খ্যাট চালাচ্ছিস—ইস্কুল যেতে হচ্ছে না।

একাদশীর দিন বেলা বারোটা পর্যন্ত নির্জলা থাকতে হতো, যেমন ঠাকুর্দাও থাকতেন। তারপর জনার্দনের প্রসাদী মিছরির পানা এবং ডাবের জল। ডাবের জলে অবশ্য আমার তেমন স্পৃহা ছিলো না, ভেতরে শাঁস থাকলে সেটাই লাভ।

কিছুক্ষণ পরে ছানা চিনি মুগের ডাল ভিজে ও কিছু ফল। রাত্রে কিন্তু কেবলমাত্র একবাটি গরম দুধ।

এই ব্যবস্থার ঈষৎ অন্তরায় ছিলো। ছানা জিনিসটা আমার গলা দিয়ে নামতো না। এবং ফলও আম কলা লিচু পেয়ারা ছাড়া হ্যানো-ত্যানো খেতে পারতাম না। ঠাকুর্দা যে কী করে পরম হৃষ্টমুখে মস্ত একটা পাকা বেলের শাঁস নিয়ে বসতেন, বসতেন থালাভর্তি ফুটি তরমুজ খরমুজ পেঁপে এবং গাদাখানেক কাঁঠালের কোয়া আর জামবাটি ভর্তি মুগের ডাল ভিজে নিয়ে, তা ভেবে পেতাম না।

অথচ বৈঁচি ফলসা এসব তো কেমন ভালো ফল। না, ওসব খাওয়া চলে না। ওসবের নাকি হবিষ্যান্নের সঙ্গে বিরোধ। কে জানে কেন, গাছেরই তো ফল। তাতে কী, গাছেরও ব্রাহ্মণ শূদ্র আছে।

ঠাকুমার প্রেরণায় পিসি একদিন বলেছিলো, একাদশীর দিন তো নাড়ুটা প্রায় উপোসেই থাকে কাকা। ছানা গিলতে পারে না, ফলটলও তেমন খায় না, গাওয়া ঘিয়ে ভাজা দুখানা লুচি আর আলুনি দুখানা

ভাজাভুজি করে দিলে খেতে পারে না ?—'আলুনি' এই জন্যে ওতে নাকি এ'টো হয় না।

পিতামহ একটু স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, তা অতো পরিশ্রমে দরকার কী? তোমাদের গেরস্থর রান্নাঘরের মাছ-ভাতেই বসিয়ে দাওগে না! পরমানন্দে খেতে পারবে!

পিসি পালিয়ে আসতে পথ পায়নি।

পৈতের পর পুরো এক বছর এইভাবেই কাটাতে হয়েছিলো আমায়।

তাহলে স্কুলের কী হয়েছিলো ?

নাঃ, ওই একটা বছর আমার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ ছিলো। ভর্তিই তো হয়েছিলাম আট বছরে, ন বছরেই ওই স্টপ। এতে অবশ্য বাদলাদা টোপাই মধুরা হিংসে করতো। বলতো, কী তোফা আছিস বাবা!—কিন্তু আমার যে খুব ভালো লাগতো তা নয়।

এ ব্যবস্থায় ঠাকুমা পিসিই শুধু নয়, জ্যাঠারাও, এমন কী বাড়ির মাস্টারমশাইও হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলে ফেললেন, পুরো একটা বছর নষ্ট হবে ?

জগৎনারায়ণ বলেছিলেন, হ্যাঁ, তোমাদের মতো বুদ্ধিমানের কাছে ওটা 'নষ্টই'। কিন্তু সকলের মগজ তো তোমাদের মতো নয়। বাড়ির ভিত গাঁথতে মাটির নীচে অনেক ইঁট বালি চুন সুরকি বিলিতি মাটি ঢালতে হয়। সেগুলোকে যদি 'নষ্ট' বলো-তো এটাও নষ্ট। তা সে নষ্টটা ওকে মেনেই নিতে হবে, জগৎনারায়ণ চৌধুরীর হাতে পড়েছে বলে।

ব্যস!

এরপর আর কেউ কিছু বলবে ?

পিতামহর মতে এই একটা বছরই নাকি 'নাড়ু' নামের ছেলেটার সবথেকে শ্রেষ্ঠ সার্থক বছর। জীবনের আর চরিত্রের ভিত গাঁথা হচ্ছে তার! 'শিক্ষা' মানেই তো আর শুধু অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল ইংরিজি বাংলা নয়, 'শিক্ষা' শব্দটা আরো অনেক উঁচু পর্যায়ের।

তা সেই উঁচু পর্যায়ে ওঠা নাড়ু বা নরনারায়ণের জীবনে একটা শিক্ষা ঘটেছিলো। সেটা হচ্ছে ওই মানুষকে পাঠ করবার শিক্ষা।

আর সাত্ত্বিকতার খুঁটিনাটি 'নিতীবিতের' শিক্ষা।—ওই দশ বছর বয়েসেই বোধহয় আমি বিধান দিয়ে দিতে পারতাম, খাঁটি ব্রহ্মচর্য পালনে কী কী গ্রহণীয় আর কী কী বর্জনীয়।. এ ছাড়াও পাঁজিকা দেখতে শেখা, এবং কোন তিথিতে কী খাওয়া নিষেধ এসবও শেখা হয়ে গিয়েছিলো আমার।

এইগুলোই তাহলে 'প্রকৃত শিক্ষা', এইরকম একটি ধারণা গড়ে উঠেছিলো নাড়ু নামের সেই পুরো একটা বছর কৃচ্ছ্র সাধনান্তে দশ বছরে পড়া ছেলেটার।

কিন্তু তলে তলে যে কতোখানি অকালপক্ক হয়ে উঠেছিলাম, তা যদি অনুধাবন করতে পারতেন পিতামহ !

শুনতে অবিশ্বাস্য, তবু সেই বয়সেই আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছে—ঠাকুর্দা যদি এতো ব্রহ্মচারী তো—ঠাকুর্দা তিন-তিনটি মেয়ে আর চার-চারটি ছেলের জনক হয়ে বসলেন কী করে ? —তাও-যে 'মেয়েমানুষ' জাতটাকে তিনি 'মশামাছি' তুল্য হেয়জ্ঞান করেন সেই জাতটারই একজনের মাধ্যমে !

দশ-এগারো বছর বয়েসে এমন কুটিল চিন্তা আর কোনো ছেলের আসে কিনা জানি না, তবে আমার এসোছিলো। হয়তো অনবরত 'ব্রহ্মচর্য' শব্দটার তাৎপর্য শুনতে শুনতে। তবে এর জন্যে নিজেকে পাপী পাতকী ভেবে কষ্টও পেয়েছিলাম। সে এক বিশেষ ধরনের কষ্ট।

তাছাড়া—এক এক সময় যেমন পিতামহর দিব্যজ্যোতিমাখা মুখ দেখে সম্মোহিত হয়ে যেতাম—যথা তিনি যখন সদ্য স্নান করে জলে দাঁড়িয়েই দুহাতে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে সূর্যপ্রণাম করতেন, অথবা যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জনার্দনের সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতেন, কিংবা পরম মমতায় কোমল স্নিগ্ধ মুখে গো-বৎসদের মুখে কচি ঘাস ধরে দিতেন, তেমন তেমন সময় মনে হতো উনি বুঝি দেবতারই একটি অংশ। রীতিমতো রূপবান পুরুষ ছিলেন তো। ওঁর কৃপাধন্য বলে নিজেকে পরম কৃতার্থ মনে করতাম।

কিন্তু আবার এক একসময় তালভঙ্গ হয়ে যেতো।

যেমন সেবার সেই সরকারমশাইয়ের ব্যাপারে। বড় বেশীই ভাঙা হয়ে গিয়েছিলো।

হ্যাঁ, 'সরকারমশাই' বলে একজন ছিলেন।

যদিও তখন আর তালপুকুরে ঘটি ডোবে না, তবু ঠাটবাটের জেরটা ছিলো কিছু কিছু। না, তখনো জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটেনি, তবে পূর্বপুরুষের জমিদারিটি জ্ঞাতি-বিরোধে আর ভাগে ভাগে তলানিতে এসে ঠেকেছিলো।

আয় বাড়ানোর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা তো ওঁদের জানা ছিলো না প্রজা ঠেঙানো ছাড়া। কাজেই কলসীর জলের তুলনাতেই এসে পড়তে হয়।—তাছাড়া—জগৎনারায়ণের এলাহি মেজাজের দরুনও কিছু কিছু কমতে শুরু করেছে।

গ্রামের দেবমন্দির সংস্কারের জন্যে অবস্থাপন্নদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে। জগৎনারায়ণ হুকুম দিলেন সবথেকে ঊর্ধ্বসংখ্যা চাঁদাটা হবে তাঁর। বহু দিন মৃত পিতার 'বাৎসরিক' শ্রাদ্ধ তিথিতে কেবলমাত্র বারোজন বামুনকে ভোজন করিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, পাঁচটি করে 'পণ্ডিত বিদায়'-রও ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন বরাবর।

মেজজ্যাঠা সংসারের আর সকলের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হলেও, পিতামহর কাছে কেঁচো-তুল্যই ছিলেন। তবু তিনি একদিন নাকি বলেছিলেন, এভাবে বরাবরের সব ঠাট বজায় রাখা কী আর সম্ভব ? জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে, ওদিকে প্রজারাও আর আগের মতো নিতান্ত বাধ্য নেই। আয়ের আর কোনো পথও নেই। কাজেই—

পিতামহ নাকি তার উত্তরে বলেছিলেন, জগৎনারায়ণ চৌধুরী যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, শেষ কর্পদকটি পর্যন্ত ব্যয় করে ঠাটবাট সব বজায় রাখবে। তার জন্যে নিজেকে বিকোতে হয় সেও-ভি আচ্ছা। তবে তোমাদের পিতার মৃত্যু হলে তোমরা প্রয়োজনবোধ না করলে পিতৃশ্রাদ্ধ করো না। ইচ্ছে হলে মৃতদেহটাকে টেনে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এসো। কোনো খরচ হবে না।

এরপর আর কে কী বলবে ?

অথচ কী এমন ব্যক্তি ছিলেন তিনি ?

হয়তো একা আমার ওই পিতামহই নয়, একদার ঐশ্বর্যবান বাঙালি যে ক্রমশ নিঃস্ব হতে হতে কাঙালি বনে গিয়েছে, তার কারণই বোধহয়

এই অহেতুক দম্ভ। এই অকারণ অহমিকা।'—'মরি তো মর্যাদায় হারবো না।'

তাই সাবানের ফানুসের মতো ক্রমশই নিজেকে ফাঁপাতে ফাঁপাতে একসময় 'ফুট' হয়ে গেছেন তাঁরা।

কথায় কথায় জমি দান করে বসাও ছিলো পিতামহর এক হবি।—তা বলে কী আর অভাবগ্রস্ত শূদ্রকে? তা নিশ্চয়ই নয়। তাঁর দানের পাত্র অবশ্যই হতো কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র কুলীন সন্তান, পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত গরীব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। অথবা বিধাতার রুদ্র রোষে ঘর জ্বলে যাওয়া বা বানে ভেসে যাওয়া নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পরিবার।

দিয়ে দাও তাদের দু-পাঁচ বিঘে নিষ্কর জমি।

সেই যে একদা যে কুলীন ব্রাহ্মণটিকে পিতামহ আশ্বাস দিয়ে বসেছিলেন, 'আপনার কন্যা আমার গৃহে যাবে—' অনন্তনারায়ণের অবাধ্যতায় তাঁর কাছে কথার খেলাপ ঘটায় খেসারতস্বরূপ ফট করে তাঁকে দুবিঘে জমি দান করে বসেছিলেন মেয়ের বিয়ের খরচস্বরূপ।

এইভাবেই জমি কমেছে এবং বাড়াবার কোনো চেষ্টা হয়নি। তবে আর পুকুরে ঘটি ডুববে কী করে? তথাপি যেহেতু জমি-জমাই আয়, তাই অবধারিত নিয়মে বারো মাস মামলা-মকদ্দমাও লেগে থাকতো।

কোর্টে 'দিন' পড়লেই সরকারমশাই সদরে ছুটতেন দলিলপত্তরের বোঝা সঙ্গে নিয়ে।

একদিন এমনি এক 'দিন' পড়ার দিনে, সরকারমশাই বেরিয়ে আর ফিরলেন না।—এবং জানা গেল তাঁর অনুপস্থির সুযোগে একতরফা ডিক্রী হয়ে গিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গের একটা মামলায় জগৎনারায়ণের হার গেছে।

তার মানে সরকারমশাইয়ের কর্তব্যচ্যুতিই এই ক্ষতির কারণ।

কিন্তু সরকারমশাই এখান থেকে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে গেলেন কেন? গেলেন কোথায়?

সরকারমশাই ব্রাহ্মণ হলেও জগুদার নাকি দেশের লোক। সেই সূত্রে দেশোয়ালি আত্মীয়। জগুদা বলতো ঘোষাল খুড়ো।

জগৎনারায়ণ নিজেদের এই ক্ষতির খবর পেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, জগু, তোমার ঘোষাল খুড়ো কি পথে সর্পদংশনে নিহত

হয়েছেন ? না কী ডাকাতে তাঁকে লুঠ করে নিয়ে গেছে ? মাঝপথে হঠাৎ উপে গেলেন কীভাবে ?

জগদুদা সরকারমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে খোঁজ এনেছেন। তিনি কাতরভাবে বলেন, গতকাল ঘোষাল খুড়োর বড়ই বিপদ ঘটে গেছে হুজুর।

ওঃ! বড়ই বিপদ! তাই এই হতভাগা জগৎনারায়ণ চৌধুরীর ক্ষতিটার কথা মনে পড়েনি ? যাকগে, তাঁকে জানিয়ে দাওগে, আর তাঁর এ দেউড়ি ডিঙোবার দরকার নেই। চৌধুরীবাড়ির অন্নটি তাঁর উঠলো।

কিন্তু হুজুর! তার বিপদটা যে বড় সাংঘাতিক।

যাক! বিপদের গল্প সারাজীবনে ঢের শোনা আছে জগবন্ধু। আর শুনতে চাই না।

জগবন্ধু আকুল হয়ে বলেছে, হুজুর, কাল ওর একমাত্র মেয়েটা—

সরকারমশাইয়ের কটা মেয়ে ছিলো, সে হিসেব আমার না জানলেও চলবে।

তবু মরীয়া হয়ে বলে নিয়ে ছেড়েছিলো জগদুদা তার ঘোষাল কাকার বাড়ির ঘটনাটি। গতকাল ভোর থেকেই নাকি তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা মেয়েটার প্রসববেদনা উঠেছিলো। তা তাতে কিছু এসে যেতো না ঘোষালের। ওসব তো মেয়েলি ব্যাপার। ধাই এসেছিলো, পাড়ার গিন্নীরা এসেছিল। কিন্তু মাত্র তেরো বছরের মেয়েটা। রোগাপটকা। ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারল না।

ঘোষাল যখন এখান থেকে বেরিয়ে একবার খোঁজ নিতে বাড়িতে উঁকি দিতে গেছেন তখন আঁতুড়ঘর থেকে কান্নার রোল উঠেছে।

যন্ত্রণায় ধড়ফরিয়ে মরে গেল হুজুর মেয়েটা। তখন আর ঘোষাল কী করেন - বাড়িতে তো আর দ্বিতীয় বেটাছেলে নাই।

'হুজুর' ব্যঙ্গতিক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমার যেমন ধড়ফড়ানি দেখছি জগবন্ধু, তোমারও উচিত কাজকর্ম ছেড়ে সেই শোকসভায় যোগ দিতে যাওয়া।—প্রসব হতে গিয়ে ওরকম ধড়ফড়িয়ে মরাটা তো মেয়েছেলেদের কোনো নতুন ব্যাপার নয়। আকছারই ঘটছে।

সেটা মেয়েমহলের ব্যাপার। সেখানে যে বাপ-ভাই গিয়ে থুবড়ে পড়ে তা জানা ছিলো না। সে যাক। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না জগৎ। সেটাই তাঁকে জানিয়ে দিও।

হুজুর ঘোষালকাকা আজ তিরিশ বছর এ বাড়ির অন্নজলে প্রতিপালিত। একদিনের জন্যেও কখনো—

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না জগবন্ধু। তিরিশ বছর এ বাড়ির অন্নজলে প্রতিপালিত, সেটা তাঁর নিজেরও মনে রাখা উচিত ছিলো। —এবং মনিবের এতো বড় ক্ষতিটা ঘটানো যে নিমকহারামি সেটা খেয়াল করার ছিলো।—কেবল নিজের সুবিধে দেখাটাই মনুষ্যত্ব নয়।'

হুকুমের নড়চড় হয়নি।

সেই তিরিশ বছরের অতি বিনীত, অতি বাধ্য আর নিরলস করিৎকর্মা লোকটিকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করলেন না পিতামহ।

বাড়িতে সকলের মধ্যেই এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে একটা চাপা প্রতিবাদ উঠেছিলো বৈকি। সকলেই মর্মাহত হয়ে মনে মনে 'ছি ছি' করেছে। কিন্তু তেমন জোরাল প্রতিবাদের সাহস কার?

এখন ভেবে পাই না, বাড়িরই একটা মানুষকে সবাই অযথা এমন যমের মতো ভর করতো কেন?

তলায় তলায় উথলে ওঠা দু একটা প্রশ্ন অবশ্য এসেছিলো কাছাকাছি। মেজজ্যাঠা নয়, বড়জ্যাঠা তাঁর মাছ ধরার ছিপটাকে পালিশ করতে করতে বলে ফেলেছিলেন, 'লোকটার মেয়েটা মরে গেল, আবার নিশ্চিত অন্নটাও ঘুচে গেল।

পিতামহ গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, এটাই ওর এসময় নিয়তি ছিলো। নিয়তি এইভাবেই আসে।

বাঃ! মেয়ে মরাটা না হয় নিয়তির হাত। কিন্তু চাকরি যাওয়াটা—

জগৎনারায়ণ আরো গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, অর্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না বড়খোকা জেনে রেখো—ওটাও একই ব্যাপার। জন্মমৃত্যু এসব তো অহরহর ঘটনা। নিয়তি অমোঘ। তা বলে মানুষ কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে পার পেয়ে যাবে? কর্তব্য হচ্ছে সকলের ওপর।

সেদিন একটা বারো বছরের ছেলে হঠাৎ তীব্র আক্রোশে মনে মনে অভিশাপ দিয়ে বসেছিলো, 'তোমার এইরকম হয় তো ঠিক হয়। বেশ হয়। দেখবো কেমন তুমি কর্তব্যকর্মে অবহেলা না করে'—

কিন্তু সে বেচারীর অভিশাপ ফলেনি।

শুধু মোহভঙ্গের একটা যন্ত্রণায় তার মনটা দীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।—

ওই জগৎনারায়ণ নামের লোকটাকে নিষ্ঠুর নির্মায়িক ভণ্ড ছদ্মবেশী বলে মনে হয়েছিলো। ধর্মের খোলস এঁটে উনি—

পরে ভেবেছি হয়তো ঠিক তা নয়।

এ বোধহয় এক ধরনের স্বখাত সলিলে ডুবে মরা।

'আমি কঠোর' নির্মম। আমি আদর্শনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ, আমার কাছে সাধারণ মানুষের মতো তুচ্ছ ভাবপ্রবণতার কোনো ঠাঁই নেই।'—এই মনোভাব। তা নইলে অনন্তনারায়ণকে ত্যাগ করতে পারলেন কী করে?

আত্মপ্রেমী অহমিকাসর্বস্ব মানুষরা এই ভাবেই হয়তো নিজের পায়ে নিজে বেড়ি পরিয়ে পরিয়ে নিজেকে অচল করে তোলে।

অথচ আবার ওই 'নিয়তি-টিয়তি নিয়ে এমন একটা গভীর দার্শনিকের সুরে কথা বলতেন, গীতার শ্লোক আউড়ে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মনে করিয়ে দিতেন. তখন আর 'ভণ্ড' বা 'ছদ্মবেশী' বলে মনে হতো না।

মনে হতো আসলে উনি নিজেই হয়তো ওই 'অমোঘ-টমোঘ'গুলো বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে এত ছোটখাট আচার নিয়ম শুচিবাই দিয়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেই বা রেখেছেন কেন?

তবে কি ওঁর নিজের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী দুটো সত্তা আছে। যে ওঁকে কখনো একরকম, কখনো অন্যরকম করিয়ে নেয়!

জানি না। বাস্তবিকই আমার পিতামহর চরিত্রটি আমার কাছে একটা প্রহেলিকা।

তো, ওই সরকারমশাইয়ের ঘটনায় মনের মধ্যে যখন বিক্ষোভ আর বিদ্রোহের ঝড় বইছে, তখন একটা ব্যাপারে হাঁফ ফেলে বাঁচলাম।

উপনয়নের এক বছর পার হয়ে যাওয়ায়, আমার বন্ধন কিছুটা শিথিল হলো।

ঠাকুর্দার ঘর থেকে সরে এসে নিজেদের দলের মধ্যে শোবার ছাড়পত্র পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল স্কুলে যাবার ছাড়পত্র। এবং মুক্ত হওয়া গেল 'স্বপাকের' দায় থেকে।

অবশ্য একেবারে গেরস্থর হেঁশেলে ভর্তি হবার পারমিশান জোটেনি। পিসিদের নিরিমিষ্যি ঘরের সদস্য হতে হলো। আমার জন্যেই ওনাদের সাতসকালে ইস্কুল টাইমে ভাত রাঁধতে হতো। তা তাতে কিছু এসে যেতো না। কাঠের জ্বালের উনুন—যখন ইচ্ছে জ্বালো নিভোও কমাও বাড়াও।—যেমন এখন এদের এই 'সিলিন্ডার গ্যাসের স্টোভ' হয়েছে, প্রায় তেমনিই। অন্তত তাঁদের কাছে তাই। ওই পিসি, নতুন ঠাকুমা, 'তিনকড়ির বৌ' না কে একজন, এঁদের জীবনে তো ওই নিরামিষ রান্নাঘরটি ভিন্ন আর কোনো কর্মক্ষেত্র ছিলো না।

তাই তাঁরা 'জ্বালানির' বহুবিধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থাও রাখতেন। এবং রান্নাঘরের সব দেওয়ালের কোলে কোলেই গর্ত খোঁড়া উনুন প্যাতা থাকতো, ছোট-বড় মেজ-সেজ মাপের।

দৈনিক চারটে গরুর দুধ তো কম হতো না। সে সবের ব্যবস্থার দায় সবই ওই ওনাদের ঘরে। ক্ষীর-সর-ছানা, ঘন দুধ, এক বলক দুধ, ছোটদের জন্যে জল মেশানো দুধ, কতো রকমই যে শুনতাম!

যাক! স্বপাকের সেদ্ধ ভাত থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমটা ডাল-চাপড়ি, পোস্তর বড়া, পোরের ভাজা, ভালো ভালো সব তরকারি খেতে পেয়ে বর্তে গেলেও, ক্রমশ সে কৃতার্থম্মন্যতা কমতে শুরু করলো ওদিকের হেঁশেলের 'কড়া' থেকে ভেসে আসা মাছ ভাজার মনমাতানো গন্ধে। যেদিন পুকুরে জাল ফেলিয়ে মাছ ধরানো হতো, সেদিন আমার 'দলের' প্রতি রীতিমতো ঈর্ষা অনুভব করতাম।

তার মানে দীর্ঘ বারোটি মাস ধরে পিতামহ মাটির নীচের গহ্বরে ইঁট-সুরকি-চুন বালি-বিলিতিমাটি ঢেলে চললেও ভিত শক্ত করে তুলতে পারেননি।

তার কারণ হয়তো কেবলমাত্র আমার রসনার দুর্বলতাই নয়,

কারণটা অন্যত্র। এই ভিত গঠনকারীর প্রতি যে ভয় ভক্তি সমীহ ভাব ছিলো, সেটা নিষ্কণ্টক ছিলো না। অহরহই একটা তীক্ষ্মমুখ প্রশ্নের যেন মনের মধ্যে বিঁধে থাকতো। এটাই কী শ্রেষ্ঠ পথ? তাহলে কেন—

অথচ পরে যখন আমি আমার বড়মামা সর্বেশ্বর রায়ের কাছে পেঁছে গিয়ে আর এক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বসলাম, সেটা তো আজীবন রয়েই গেল। এখনো এই নরনারায়ণ চৌধুরী 'খদ্দর' ছাড়া আর কিছু গায়ে তুলতে পারে না।

কিন্তু কবে সেখানে পেঁছে গেছলাম?

কবে থেকে শুরু হয়েছিল জীবনের আর একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অধ্যায়!—দূরবীনের কাচটা এখানে একটু ঝাপসা।—সেটা কী স্কুলজীবনে থাকতে থাকতে? নাকি প্রবেশিকার গণ্ডী পার হয়ে?

পিতামহর শরীরে 'শ্বেতি' দেখা দিয়েছিলো কোন সময়?—

শরীরে এই পাতকজানিত ব্যাধি নিয়ে গৃহদেবতার পূজার্চনা চলে কিনা তার বিধান নিতে পিতামহ যখন নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ ভাটপাড়ায় ছুটোছুটি করছেন, তখন তো আমাকেও সঙ্গে যেতে হতো অনেক সময়।—

আমাদের কবিরাজমশাই অবশ্য বলেছিলেন 'শ্বেতি'কে ঠিক 'কুষ্ঠ' বলা চলে না আসলে—

কিন্তু পিতামহ তো তখন অস্থির অধীর ক্ষিপ্তপ্রায়। তারপর সেই কবে যেন একদিন—

বাবা! আপনি আবার এখানে এসে বসেছেন? এখন তো গরম! ঘরের মধ্যে পাখা রয়েছে—

আমার মেজছেলের বৌ বাবলির মার্জিত কোমল মাপা স্বরটি আমাকে অনেক দূর থেকে হঠাৎ যেন অদৃশ্য একটা সুতোর একটা হ্যাঁচকা টানে এদের এই বারান্দায় আছড়ে এনে ফেললো।—

তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই বাইরেটা রোদে ভরে গেছে। এখানটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে।

খুব লজ্জা করলো। বললাম, প্রভু অফিস বেরিয়ে গেছে?—

হ্যাঁ তো। ক-খো-ন। আপনাকে বলতে এসেছিল। ফিরে গিয়ে বললো, আপনি বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ইস্! ছি ছি।

বাঃ। এতে ছি ছি-র কী আছে? বয়েস হচ্ছে না? একটু তো 'উইকনেস' আসতেই পারে।—

তারপর আবার বললো, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে বাবা, আপনার প্রেসারটা একবার চেক্ করা দরকার। 'লো' হয়ে পড়েছে কিনা কে জানে।—

বাঃ। খামোকা 'প্রেসার লো' হতে যাবে কেন?

বাবলি মিহি গলায় ঝনঝনিয়ে হেসে উঠলো। বাবলির তিস্তার, দুজনেরই হাসির শব্দে বিশেষ একটি ঝঙকার ফুটে ওঠে। যেন কোথায় কার হাত থেকে একটা কাচের গ্লাস পড়ে গেল।

হাসি থামিয়ে বললো, অসুখরা কী সব সময় বলে-কয়ে যুক্তি-তক্কো করে এসে শরীরে ঢুকে পড়ে বাবা?—খামোকাই আসে। বেশ তো, না এসে থাকে ভালোই। একবার দেখাতে দোষ কী?

আমার আবার মনে হয়, আচ্ছা আগে কখনো কী এরা আমার 'প্রেসার' সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হতো? যখন সবাই একসঙ্গে ছিলাম! অবশ্য আমার বড়ছেলে বড়বৌ নয়। তারা বরাবরই প্রবাসী।—

কিন্তু এরা তো ছিলো।

মনে হলো হয়তো এটাই স্বাভাবিক। সেখানে এদের ওপর কোনো দায়িত্বভার ছিলো না। সংসারটা ছিলো কল্যাণীর। তার স্বামী-পুত্রের দায় তারই। এখানে এরা যেন একটা পরের জিনিস নিয়ে এসেছে, তাই সদা সতর্কতা।

উঠে পড়লাম।

বললাম, তোমার এই বারান্দাটায় বাপু একটা মাদকতা আছে বেশীক্ষণ বসে থাকলে নেশা নেশা ভাব আসে।

বাবলি আবার তেমনি করে হেসে উঠলো।

বললো, বাবা, আপনি নিশ্চয় কম বয়েসে কবিতাটবিতা লিখতেন!

আমি বললাম, হায় কপাল! কম বয়েসে যা একখানি গার্জেনের

হেফাজতে কেটেছে ! কবিতা তার ত্রিসীমানায় আসতে পারবে এমন সাধ্য ?

হঠাৎ আবার সুতোটার ওদিকে গড়িয়ে চলে গেলাম।

মনে হলো, এখনকার এরা কতো সহজ স্বচ্ছন্দ ! আমি তো ওর শ্বশুর ? অথচ কেমন মেয়ের মতো গল্প করছে।

মেয়ের মতো !

আমাদের সেই ছেলেবেলার আমলে মেয়েরাই কী বাপ-জ্যাঠার কাছে এমন স্বচ্ছন্দে গল্প করতো ? এরা তো রীতিমতো ঠাট্টা-তামাশা করেও কথা বলে আমার সঙ্গে।

আচ্ছা—জঙ্গীপুরের সেই খাবার-দালানটা বন্দনা করি।—যেখানে বড়জ্যাঠা মেজজ্যাঠা দুপুর পার করে তোয়াজ করে খেতে বসতেন। আমিষঘর নিরামিষঘর, দু-ঘরের সর্ববিধ অবদান তাঁদের সেই বিশাল মাপের খাগড়াই কাঁসার বগিথালার ওপর এসে অবস্থান করতো।—সেখানে তো আমার জ্যাঠতুতো দাদাদের বৌ-রা পাখা হাতে নিয়ে বসতো একটু দূরে। জ্যাঠারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা কইতেন, গোল হয়ে ঘিরে বসতেন ঠাকুমা এবং তুতো ঠাকুমারা। বসতেন পিসিও। শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা দুর্গাদি রত্নাদি ছোড়দিও থেকেছে কখনো কখনো। কিন্তু ওনাদের সঙ্গে গল্প করতে বসেছে কে ?

কথার মধ্যে ঠাকুমা পিসিদের অনুরোধ-বাণী, আর দুখানা ঝাল-মাছ নে না ?—মোচার ঘণ্ট ভালো হয়েছে বললি আর একটু নিলি না কেন ? পোস্তর বড়া দিচ্ছি বাপু আর দুখানা।—

ওনারা কখনো না না করতেন, কখনো নিয়ে ধন্য করতেন। ছেলের বৌয়েরা তো দূরস্থান, মেয়েরাই-বা পাত্তা পেতো কই ? অথবা এগিয়ে এসে কথা বলতো কই ?

বৌরা একগলা ঘোমটার আড়ালে বসে ঘামতো মাত্র। তবু কাছে বসে থাকা দরকার। শ্বশুরের খাবার সময়, পুতবৌ ঘরে বসে থাকবে ? এমন অশোভন বেসহবত দৃশ্য কে সহ্য করবে ? পরে বৌকে বাবার বিয়ে, খুড়োর নাচন দেখিয়ে ছাড়বেন না গিন্নীরা ?

মেয়েদের দুর্গতি কী শুধু সমাজপতি পুরুষরাই করে এসেছেন ? দুর্গতিকারিণীর প্রধান ভূমিকা তো ছিলো ওই মহিলাকুলেদেরই।—

অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা যেমন কোনো এক ক্ষেত্রে ভয়ানক শাসিত হতেন, সেই 'শাসনের' আচোটটা পড়তো তাঁদের অধস্তনদের ওপর। 'ক্ষমা' শব্দটা বোধহয় শুধু অভিধানেই থাকতো —

একাল তাহলে নিজেদের জীবনটা সহজ সুন্দর আর আনন্দের করে তোলবার সাধনা করেছে।

তো আমরাই বা তাতে বাগড়া দিতে যাবো কেন ?

বাবলি বললো, বাবা ! আমার কিন্তু স্নান হয়ে গেছে। আপনি স্নান করে এলেই—

আমি বলে উঠলাম, অ্যাঁ ! সেই বিরাট পর্বটি সমাধা হয়ে গেছে ? গুড্ ! ব্যাস। আমি এই চললাম। জাস্ট এক মিনিট !

হ্যাঁ, তা আর না। আপনি তো কিছুতেই ছাড়বেন না, নিজে নিজে ওই ভারী ভারী খদ্দরের কাপড়জামাগুলো কাচবেন। গেঞ্জিতে সাবান দেবেন !—কোনো মানে হয় না।

আচ্ছা ! তবু দেখো।

অতো তাড়াহুড়ো করতে হবে না আপনাকে। কিন্তু কাজের মেয়েটা যখন রয়েইছে—

চিরকেলে বদ অভ্যাস—বদ অভ্যাস বড় খারাপ জিনিস বৌমা। মরণকাল পর্যন্ত কামড়ে ধরে থাকে। তোমার শাশুড়ীর কাছে কী এর জন্যে কম বকুনি খাই ?

হ্যাঁ, আমি জঙ্গীপুরের সেই জগৎনারায়ণ চৌধুরীর নাতি নরনারায়ণ চৌধুরী এরকম কথাবার্তা কইতে লজ্জাবোধ করি না।

অতএব এরাও না।

খেতে বসে বাবলি অনায়াসে বলে, 'প্রেসারে' যদি কোনো গোলমাল না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে মার জন্যে আপনার মন কেমন করছে।

হেসে উঠলাম। বললাম, তুমি মেয়েটি আচ্ছা ফাজিল তো। ওঃ। পড়তে একবার আমার জঙ্গীপুরের পিতামহর সামনে—

বাবলি দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো। বললো, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।

একসঙ্গেই খেতে বসেছি আমি আর আমার ছেলের বৌ ! কাজের মেয়েটা টেবিলে সব এনে সাজিয়ে রেখে গেছে, বাবলি দুজনের থালা

ঠিক করে, মেয়েটাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে খেতে বসেছে।

গল্প করে করে অনেকক্ষণ খাওয়াটা চলে।

রিচি রোডের বাড়িতে ঠিক এমনটা হতো না। মানে সেরক পরিস্থিতিই হতো না।—কল্যাণী কিছুতেই একসঙ্গে বসে পড়তে পারতো না। 'তোমাদের হোকনা বাপু, যদি কিছু লাগে টাগে- বলে দেরী করতো। এরা অনেক স্মার্ট, অনেক করিৎকর্মা। এদে জীবনযাত্রার ছক এখন এই—নতুন পাড়ার ছাঁচে ঢালাই করে নিচ্ছে।

কল্যাণীও অবশ্য এমন কিছু সেকেলে নয়, কল্যাণীর জীবনে তে অনেক প্রগতির ইতিহাস, তবু ঠিক এদের মতো হতে পারে না আজকের এরা জানে 'জীবন' জিনিসটা উপভোগ করবার।—

আমার জ্যাঠাদের বংশধরেরা কেউ কেউ এই কলকাতায় এসে বাস বাঁধলেও, যেন 'দেশের বাড়ি'র খানিকটা বয়ে নিয়ে এসে জীবনের মাঝখানে স্থাপন করে রেখেছে।—গিয়েছি তো মাঝে মাঝে ওদের কারো বিয়েটিয়েয়।

ঘটা করে পৈতে-টৈতে অবশ্য আর এখন হয় না। মানে দিে উঠতে পারে না। অর্থাৎ 'অবশ্যকরণীয়' হিসেবে যে নিষ্ঠাটি থাকলে শত অসুবিধের মধ্যেও—পারিবারিক রীতিনীতির ধারাটি শক্ত মুঠোয় ধরে রাখা যায়, সেই নিষ্ঠাটিই অনুপস্থিত।—কাজেই পৈতে হয় ছেলেদের বিয়ের সময়—একই নান্দীমুখের আয়োজনে।

তবু দেখে মনে হলো, ওরা এখনো জগৎনারায়ণের সংসারের সঙ্গে বাঁধা আছে। ওদের বৌরা এখনো শ্বশুর-ভাসুর দেখে ঘোমটা দেয় গুরুজনদের সামনে স্বামী স্ত্রীরা তেমন কলহাস্যে গল্প করে না।

'সমাজের পরিবর্তন হয়েছে' এটা একটা আপেক্ষিক কথা।

বন্যার জল যেমন সরে গিয়েও, কোনোখানে খানাখন্দ গর্তেটতে খানিকটা জল জমে থাকে, সেইরকম, সব যুগেই সব যুগের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটু রয়ে যায়, আবার কোথাও-বা ফ্রেশ চর জেগে ওঠে।

টেবিলে রাখা ডাল থেকে বাঁ হাতে চামচ করে তুলে তুলে আমার পাতে দিতে দিতে বলে, ও বলে গেছে অফিস থেকে ওখানে নীলোৎপলবাবুদের একটা ফোন করে মাদের খবরটা নিয়ে নেবে।

'ওখান' মানে অবশ্য রিচি রোডের বাড়ি। নীলোৎপল সে বাড়ির একতলার দুখানা ঘরের ভাড়াটে। তবু তাদের ফোন আছে। আমাদের নেই। তার মানে চাহিদা নেই।

আমার বড়ছেলে যখন ছুটিতে আসে, তখনই একবার করে বলে, এ হচ্ছে তোমাদের একরকম 'মধ্যবিত্ত মানসিকতা'। আধুনিক জীবনে যেগুলো অবশ্য-প্রয়োজনীয়, তার জন্যে চাহিদা অনুভব করো না। বলে তবে চেষ্টা করে আনায়ওনি। অবশ্য থাকেও না।—

আর প্রভু? ও তো বলে রেখেছে, শীগ্‌গিরই অফিস থেকে ওকে ফোন আর গাড়ি দেবে।—তা সেই ফোনটা অবশ্যই ওর এই নতুন ফ্ল্যাটে দেবে বলে, স্থগিত রেখেছে।

বাবলি একথা বললো না, 'ও অফিস ফেরত একবার মার কাছে ঘুরে আসবে—' বললো ফোন করে খোঁজ নেবে।

তা সেটাই কী কম প্রাপ্তি?

আমি হেসে বললাম, কেন বল তো? আমায় সকালে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়তে দেখে ভাবনা ঢুকে গেছে না কী?

মোটেই তা নয়। বললো, মা নিশ্চয় ভেবে সারা হচ্ছে। ভাবাই স্বাভাবিক তো।—

অথচ সেই কল্যাণী!

একদা যে মেয়ে রাস্তায় পিকেটিং করতে নেমে, পুলিশের হাতে পিটুনি খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে গ্রেপ্তার বরণ করেছে, তবু নতি-স্বীকার করেনি!

মেয়েরা 'মা' হয়ে পড়লেই কী মনের জোর হারিয়ে ফেলে? আজকের কল্যাণীকে দেখলে কে বিশ্বাস করবে তার অতীতে এমন একখানা মারকাটারি ইতিহাস আছে।—এখন তো ছেলেদের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হচ্ছে দেখলেই জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর তাদের খাওয়া-দাওয়ায় একটু ঘাটতি ঘটলে সারাদিন মন খারাপে ভোগে। আমি যদি হাসি, বলি, সেই অগ্নিকন্যা কল্যাণী বাগচীর এই অধঃপতন? তাতে লজ্জার বালাই দেখি না। বলে, 'মা' হলে কী হয়, তা আর কী বুঝবে?—আমি আবারও হাসি, এ কাঠামোয় আর এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার উপায় নেই।

কিন্তু সেই অগ্নিকন্যার ইতিহাসটি কবে কোথায়? আর সেই 'নারায়ণ বাড়ির' জগৎনারায়ণের ন্যাতাজোবড়া নাতি নরনারায়ণ চৌধুরীর এমন একখানা মধুর যোগাযোগ ঘটলো কী সূত্রে?

সে সূত্র খুঁজতে হলে তো আবার চোখটাকে পাঠিয়ে দিতে হয়, অনেক অনেকখানি পিছনে। সেই যেখানে ফের অহঙ্কারী জগৎনারায়ণ সহসা এক অভাবনীয় অবস্থার শিকার হয়ে 'বিধান' নিতে পণ্ডিত খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ভাটপাড়া নবদ্বীপ উভয় জায়গা থেকেই রায় পেয়ে যাওয়া হয়েছে, শ্বেতি রোগগ্রস্তের গৃহদেবতার সেবায় বাধা নেই, তবু পিতামহ নিশ্চিত বিশ্বাসের শান্তি পাচ্ছেন না। মনের মধ্যে বাসনা, একবার যদি কাশীর কোনো পণ্ডিতের কাছ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া যেতো।

তা ঐকান্তিক আকুলতার ফল ফললো। একদিন কে যেন খবর দিল, 'কান্দী'তে কার বাড়িতে যেন কাশীর কোন এক মহামহোপাধ্যায় বাঙালী পণ্ডিত এসেছেন, থাকবেন ক'দিন, ওটি তাঁর শিষ্যবাড়ি।

পিতামহ তাঁর বড়ছেলেকে ডেকে বললেন, 'আত্মঘাতী' হওয়া মহাপাতক, তাই এখনো এই ঘৃণ্য দেহটা বহে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তবে যদি বাকি জীবনটা অন্তত জনার্দনের সেবার অধিকারটি থাকে তাহলে আর সেই মহাপাতকে প্রবৃত্ত হই না। জানি না পূর্বজন্মের কোন মহাপাতকে এ জন্মে—যাক তুমি একবার নরনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে 'কান্দী'তে চলে গিয়ে সেই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করে সর্বশেষ ব্যবস্থা জেনে এসো।

আমার পৈতের পর থেকে উনি আর কখনো আমায় 'নাড়ু' বলে উল্লেখ করেননি। তবে নিজের ছেলেদের যখন পুরো নাম ধরে না ডেকে 'বড়খোকা', 'মেজখোকা' বলে কথা বলেন, তখন বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছেন। পুরো নামটা ডাকতে আলস্য লাগছে। দেখে দুঃখও হতো খুব। কিন্তু কেন যে তেমন সহানুভূতি আসতো না! হঠাৎ হঠাৎ মনে হতো 'পাতক' খুঁজতে কী মানুষকে পূর্বজন্ম হাতড়াতে হয়?

কিন্তু ভেবে পাইনি পিতামহ কেন তাঁর করিৎকর্মা চৌকস 'মেজখোকাটিকে' এ ভার দিলেন না সেটাই আশ্চর্য।

বড়জ্যাঠা তো বলতে গেলে বাড়ির একটা বাচ্চা ছেলেপুলের শামিল। ওঁর ওপর যে কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়, এটাই কারো ধারণা ছিলো না। কাজের মধ্যে ডজনখানেকের ওপর জীবকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার সহায়তা করেছিলেন। তবে তাদের সম্পর্কে চিন্তামাত্র ছিলো না বড়জ্যাঠার। তাঁর মতে 'বাড়ির ছেলেমেয়ে' বাড়ি বুঝবে।

তিনি মাছ ধরে, দাবা খেলে, তাস খেলে, পরিতোষ করে খেয়ে খেলিয়ে বেরিয়ে, বাকি সময়টি ব্যয় করতেন মজার মজার সব কাজে। —সে কাজে বালখিল্য বাহিনী তাঁর সঙ্গী, বশংবদ খিদমদগার।— নিজের ছেলেমেয়ে এবং আরো অন্য ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁর কাছে একই পর্যায়ে!—

বড়জ্যাঠা আমবাগানে দোলনা টাঙাতে লেগে গেলেন। সে এক এলাহি ব্যাপার। এক-আধটা দোলনা হলে তো চলবে না। সদস্য-সংখ্যা তো কম নয়, কে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? অতএব মজবুত মতো জুতসই ডাল দেখলেই লেগে যাও তাকে নিয়ে। আর বড়জ্যাঠা নিজের জন্যেও একখানা বানিয়ে নিয়ে বসে দোল খেতেন। স্পীড কমে গেলেই হাঁক পাড়তেন, 'এই, আমারটা ধাক্কিয়ে দে।'

সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

রথের সময় বাচ্চাদের টানবার জন্যে রথ বানানো, তাতে ফুলপাতা দিয়ে সাজানো, এবং মাটির জগন্নাথ গড়া, এতে বড়জ্যাঠার দারুণ উৎসাহ! বাগান তৈরী বাগান তৈরী খেলা, সেও ওই বালখিল্যদের নিয়ে তবে নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো—যতটা সম্ভব 'কর্তার' চোখ এড়িয়ে চুপিচুপি। তাতে ভারী আমোদ ছিলো ওনার।

ছোটদের আমবাগানে ভাগিয়ে আনা, সেটি হতো জগুদাকে ঘুষ দিয়ে।

অথচ এই 'বাল্যলীলার' অব্যাহত ধারার মধ্যেই বড়জ্যাঠার মেয়ে-ছেলেদের বিয়ে, নাতি-নাতনীর আবির্ভাব সবই হয়ে চলেছে। ওসব ঘটনা ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে কেউই ওনার দ্বারস্থ হয় না। উনি বাড়িতে কাজকর্ম হচ্ছে জেনে উৎফুল্ল হন, 'নেমন্তন্ন' জুটবে বলে।

কিন্তু বড়জ্যাঠা সম্পর্কে একমাত্র মেজজ্যাঠা ছাড়া আর কারো মুখে

নিন্দেমন্দও তো শোনা যেতো না। সকলেই বলতো 'ও'র কথা ছেড়ে দে।'—সকলেই জানতো 'ও'র কথা বাদ দিতে হয়'। এবং ও'কে ভালোবাসতে হয়।

এ হেন বড়জ্যাঠাকে এমন একটা গুরুভার দেওয়া!

ঠাকুমা পর্যন্ত নিজের 'পজিশন' ভুলে বলে ফেলেছিলেন, 'ওই অভব্য'টিকে পাঠানো হচ্ছে? ও পারবে? মেজখোকাকে বললে হতো।'

পিতামহ বলেছিলেন, 'কাকে কি বললে ভালো হয় সে বোধটা আমার এখনো লোপ পায়নি। সেটা লোপ পেলে অন্দরমহলের পরামর্শে চলা যাবে।'

তারপর কী ভেবে বললেন নরনারায়ণও তো সঙ্গে যাচ্ছে।

এটুকু নম্রতাও ওনার পক্ষে অস্বাভাবিক। যদিও নরনারায়ণ তখন সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে। সেই আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। কান্দী যাওয়া হলো।

গিয়ে জানা গেল মহামহোপাধ্যায় আগের দিন চলে গেছেন।

আশাভঙ্গে মর্মাহত দুজনে ফিরছি, হঠাৎ স্টেশনে এক অভাবিত দর্শন।

বড়মামা!

বড়মামার পরনে মোটা আর খাটো বহরের খদ্দরের ধুতি, গায়ে তেমনি মোটা বহরের পাঞ্জাবি, মাথায় গান্ধী টুপি।

কিন্তু আমি কী চিনতে পেরেছিলাম তাঁকে? অথবা তিনি আমাকে?

দেখাদেখি তো সেই দশ বছর আগে। নাড়ু যখন সাড়ে চার বছরের! এখন সে সাড়ে চোদ্দ বছরের। কিন্তু বড়জ্যাঠা দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন, সর্বেশ্বর ভায়া না? আজিমগঞ্জের যজ্ঞেশ্বর রায়ের—

বড়মামা পথের ওপরেই মাথা হেঁট হয়ে প্রণাম করে বললেন, আমায় চিনতে পেরেছেন বড়দা?

বড়জ্যাঠা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, চিনতে পারবো না মানে? সেই সেবারে ঝুলনের সময় কুটুমবাড়ি বেড়াতে এসে তুমি আমার কম খিদমদগারি খেটেছিল? তোমার সেই আমপাতার 'পদ্মফুল' এখনো

চোখের ওপর ভাসে। অমনটি আর কেউ করতে পারলো না। তা এখানে?

এই একটু কাজে—

তারপরই হঠাৎ বলে উঠলেন, একটা আর্জি জানাবো?

আর্জি! সেটা আবার কী?

সেটা 'কী' তা বুঝিয়ে দিলেন সংক্ষেপে বড়মামা।

এখানে এক আত্মীয়বাড়িতে বিয়ে না কী উপলক্ষে এসেছেন বড়মামা, সঙ্গে বোন আর ভাগ্নী। অর্থাৎ নাড়ু নামক ছেলেটার মা এবং বোন। তো 'বড়দা' যদি অনুমতি করেন, একবার ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে তার মাকে দেখান সর্বেশ্বর।

হয়তো বড়জ্যাঠার সহৃদয়তার ভঙ্গিতেই এত সাহস। তা সাহসের মান রেখেছিলেন বড়জ্যাঠা। বলে উঠেছিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। এতে আবার এতো 'কিন্তু'র কী আছে? মানুষের জন্মমৃত্যু ভগবানের হাতে, অথচ কর্তা এক ভুল ধারণার বশে গোঁয়াতুর্মি জেদ ধরে মা ছেলেকে জন্মের শোধ আলাদা করে রেখেছিলেন। যাক, হঠাৎ যখন ভগবান একটা সুযোগ দিয়েছেন, দেখা হবে বৈকি!

বড়জ্যাঠাকে আমি কোনোদিন তেমনভাবে পুজোটুজো করতে দেখিনি। পিতামহর মতো তো নয়ই, মেজজ্যাঠার মতোও দীর্ঘস্থায়ী নয়। আরতির সময় বা বিশেষ বিশেষ কারণে যখন ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে যেতেন, দেখে মনে হতো, আমাদের মতো 'ধরে ভদ্র ঘটানো অবস্থা'।

কিন্তু সেদিন সেই রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ মনে হলো, সত্যিকার ভগবানভক্ত যদি বাড়িতে কেউ থাকে তো সে হচ্ছে বড়জ্যাঠা।

সেই পরম মুহূর্তে আমার জীবনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন।

মাকে দেখলাম। দেখলাম আমার ছোটবোন মিনিকে। ভালো নাম যার মিনতি। এবং তার পিতৃগৃহের হচ্ছে 'রাক্ষুসী'।

বাড়ি ফিরে আসা হলো ভগ্নদূতের ভূমিকায়।

পিতামহ সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে উঠেছিলেন, 'তীর্থবাসে পাতক ক্ষয়'। স্থির করছি এক বৎসরকাল কাশীবাস করবো।

হতে পারে এখন একটু বিকল অবস্থা, তবু সেই ব্যক্তিই তো। যাঁর ঘোষণা, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।'

অতএব শুরু হয়ে গেল তেড়েজোড় কাশীবাসের।

তখনকার দিনে তোড়জোড় যে বেশ কিছু ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। তবে সুবিধেও ছিলো কিছু। গিয়ে উঠবেন এ বংশের পাণ্ডার বাড়িতে, অতঃপর যেমন বা হয়। সঙ্গে যাবে জগু।

এখানে—জনার্দনের পুজো এখন যেমন কুলপুরোহিত ভট্টাচায্যি-মশাই চালাচ্ছেন তেমনি চালিয়ে যাবেন। আর ছোটখাটো ব্যাপারগুলি, যেমন ঠাকুরকে 'ঘুম পাড়ানো', 'ঘুম ভাঙানো', 'গরমের সময় হাওয়া খাওয়ানো' এসব করবে নরনারায়ণ, অর্থাৎ নাড়ু।

সেই মুহূর্তে 'নাড়ুর' মধ্যে এক বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটে গেল। নাড়ু বলে উঠলো, একজামিনের খবর বেরোলেই আমি আজিমগঞ্জ কলেজে ভর্তি হবো।

জগৎনারায়ণ আকাশ থেকে পড়া গলায় বললেন, আজিমগঞ্জে! ওখানে থাকবার মতো হস্টেল আছে?

নাড়ু বললো, হস্টেল কেন? বাড়িতেই থাকবো।

বাড়িতে! জানাশোনা কোনো বাড়ি আছে না কী?

আছে।

তাই না কী? কে আছে সেখানে? অ্যাঁ!

নাড়ু বুকে পাথর বেঁধে বললো, মা বোন দিদিমা মামারা।

ওহো হো। তাই তো। তোমার যে এতোসব আছে খেয়াল ছিলো না।

জগৎনারায়ণ চৌধুরীর চোখের দু-তারায় ফস করে দুটো দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠলো। শ্লেষের গলায় বললেন, অতি উত্তম। তাহলে বোধহয় নরনারায়ণ চৌধুরীর শিক্ষাখাতে জঙ্গীপুরের চৌধুরীবাড়ির ভাঁড়ার থেকে আর কোনো খরচ লাগবে না!

অর্থাৎ এও একরকম 'ত্যাজ্য' করার মতো ভীতিপ্রদর্শন।

ভাবটা যেন, ওঃ। পাখা উঠেছে। দ্যাখোগে কত ধানে কত চাল।

নাড়ু অবশ্য এই অদৃশ্য মন্তব্যের কোনো উত্তর দেয়নি। তবে,

ওই জগৎনারায়ণের ভাঁড়ারের দরজায় আর কখনো হাতও পাতেনি।

চৌধুরীবাড়ি থেকে রায়বাড়ি।

যেন জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে খোলা মাঠে!

ব্যাচিলার বড়মামা বাড়িতে তিন তিনখানা তাঁত বসিয়েছেন। সারা অঞ্চলে যে যত সুতো কাটতে পারে, নিয়ে নেন তিনি। কাজে লাগান।—বাড়িতে তো সারাদিন সবাই যে যেমন পারছে চরকা কাটছে, তকলি কাটছে। দিদিমা তো রান্না করতে করতেও তকলি কাটছেন।

এ এক আশ্চর্য হালকা হাওয়ার জগৎ।

এ বাড়িতে কাউকেই সদা সন্ত্রস্ত সদা সতর্ক হয়ে থাকতে হয় না। সকলের হাসিমুখ। সবাই সবাইকে ভালোবাসে।

আমার চিরদুঃখিনী মা?

তাঁর মুখেও একটি আশ্চর্য প্রসন্নতার হাসি। দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিলো, সেই যে এক বৈশাখী ভোরে নিমফুল আর চাঁপাফুলের উদাসী গন্ধের মধ্যে ওই আমার মার শাড়ির পাড়ের লাল রংটা মুছে উড়ে গিয়েছিলো, সেটা বোধকরি তাঁর ওপর ভাগ্যের আশীর্বাদ। সেটা থেকে গেলে আজকের এই নির্মল শুভ্র জীবনটি কী পেতেন মা?

জঙ্গীপুরের চৌধুরীবাড়ির সেই রান্নাঘরে ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকা অনেকগুলো বিবর্ণ মলিন লাল-পাড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যেতেন।—সেই হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে হয়তো ক্রমশই বড়জ্যেঠি মেজজ্যেঠিদের মতো হয়ে যেতেন। জীবন আবর্তিত হতো একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। যেখানে জমাট হয়ে আছে ভীরুতা, মূর্খতা আর ছোট স্বার্থ, ছোট প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির টানাপোড়নে বোনা একটা মলিন জীবন।

আর মিনু? ওই ছটফটে সুন্দর প্রাণচঞ্চল মেয়েটা? সেখানে থাকতে হতো 'রাক্ষুসী' নাম বয়ে বেড়ানো একটা চিরঅপরাধীর ভূমিকায় পড়ে থাকা কুণ্ঠিত একটা প্রাণীমাত্র হয়ে।

আর নাড়ু নামের ছেলেটার মধ্যে যে হঠাৎ এক মহামুহূর্তে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিলো, সেটাও বোধহয় তার ভাগ্য-দেবতার প্রসন্ন প্রেরণা।

কল্যাণী মিনুর সহপাঠিনী বন্ধু।

কল্যাণীর দাদা বড়মামার হরিহর একাত্ম বন্ধু

কল্যাণী গান্ধীবাদী সর্বেশ্বর রায়ের মন্ত্রশিষ্যা।

সত্যি বলতে, যে সময়ে আমার জীবনের নতুন দিগন্তের উন্মোচন, সে সময় 'মহাত্মাজী'র নামে অসমুদ্র হিমাচল যে উত্তাল উন্মাদনা, তার কিছুটা যেন ফিকে হয়ে আসছিলো। অনেকের বাড়িতেই তখন হাতে হাতে ঘোরা তকলিরা তাকে উঠে বিশ্রাম-সুখে রয়েছে। আর চরকা-টরকারা ভাঙাচোরা গোছের হয়ে বাড়ির কোনো একখানের কোণে নির্বাসিত।—তখন বাতাসে বারুদের গন্ধ। 'বিয়াল্লিশের আন্দোলন' এখানে সেখানে পাখা ঝাপটাচ্ছে।

সর্বেশ্বর রায় কিন্তু আপন আদর্শে অবিচল।

অতএব তাঁর মন্ত্রশিষ্যরাও! সে মন্ত্র হচ্ছে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

আমারই চোখের সামনে কল্যাণী বালিকা থেকে তরুণী হয়ে উঠেছিলো। আর কল্যাণীর চোখের তারায় যে প্রেমের উজ্জ্বল আভাস ক্রমশই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিলো, সে শুধু দেশপ্রেমেরই নয়।—

তবু মিনু কল্যাণী আর পাড়ার আর একটা মেয়ে চলে যেতো সর্বেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। 'ভারত ছাড়ো' স্লোগানে মুখর হতে।—একবার তো কতগুলো দিনের জন্যে চলে গেল লবণ আইনভঙ্গের দলে মিশে কোথায় যেন।—একদা আমিই ওর নাম দিয়েছিলাম 'অগ্নিকন্যা'।

আচ্ছা আমরা কী তখন এ যুগের ছেলেমেয়েদের মতো 'প্রেম-কবা' শব্দটা জানতাম? নাকি কোনদিন খেয়ালে এসেছিলো আমরা দুজনে প্রেমে পড়ে মরেছি!

কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, সত্যিই কিন্তু আমি অন্তত সেটা টের পাইনি।—কল্যাণীকে দেখলেই কেন যে আমার মনের মধ্যে হাজার বাতির আলো জ্বলে ওঠে, আর দৈবাৎ কোনো সময় একা ওর

সঙ্গে মুখোমুখি হলে, বুকের মধ্যে ড্রাম পেটে, তার কারণ অনুসন্ধান করিনি।

অবশ্য ওর কথা ও জানে।

তবে পরে, বেশ অনেক পরে কল্যাণী বলেছে, 'ওঃ, কী ন্যাকাই ছিলে তুমি! নেহাত আমার মতো হায়া লজ্জাহীন আর ডাকাবুকো মেয়ে না হলে, আর শেষরক্ষে হতো না।'

মিনুর থেকে বয়সে কিছুটা বড় ছিলো ও। মিনু বলতো, 'কল্যাণীদি'। সত্যি বলতে, প্রত্যক্ষভাবে কল্যাণীর প্রেমমুগ্ধাই ছিলো আমার ওই ভারী সরল সুন্দর বোনটা। ওর গল্পের মধ্যে সিংহভাগই 'কল্যাণীদি'। তা সে মার সঙ্গেই হোক, আর আমার কাছেই হোক। 'জানো মা—কল্যাণীদি না', 'জানো দাদা—কল্যাণীদি না—'

ও যখন প্রথম জেনেছিলো আমি ওর সত্যিকার দাদা, হঠাৎ যাকে বলে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলেছিলো। মার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে বলেছিলো, 'মা, মাগো! ঠিক বলছো—আমার সত্যি দাদা! নিজের দাদা! অন্য মেয়েদের যেমন সত্যিকার নিজের দাদা?'

আর সহসা আমার কাছে সরে এসে আমার হাঁটুতে আলতো আলতো একটু হাত ছুঁইয়ে ভীরু অথচ উজ্জ্বল চোখে বলেছিলো, 'তুমি আমায় ভালোবাসবে? আর চলে যাবে না?'

আমার এযাবত দেখা মেয়েদের মধ্যে বছর দশের একটা মেয়ের এই ভাষা আর ভঙ্গি, অভূতপূর্বই। জঙ্গীপুরের ওখানে তো এ বয়েসের মেয়েরা রীতিমতো 'মেয়েমানুষ'! তলে তলে হয়তো 'বিয়ে' আর 'বরের' স্বপ্ন দেখছে।

হবে না কেন। চার-পাঁচ বছর বয়েস থেকেই তো তাদেরকে ছেলেদের দল থেকে আলাদা করে রাখা হয়। আর তাদের চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়, 'পরের ঘরে যেতে হবে'।…উঠতে-বসতে ওই 'পরের ঘরে যেতে হওয়ার' ভয়াবহ ঘটনাটির জন্যে তালিম দিতে দিতে, বেচারীদের 'নিজের ঘরের' সুখস্বাদটুকুও কখনো পেতে দেওয়া হয় না।—উঠতে বসতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-তিরস্কার আর উপদেশবাণী, 'ভেবেছিস কী? পরের ঘরে যেতে হবে না?'—'আমের ঝুড়ি থেকে নিজে তুলে নিয়ে আম খেয়েছিস? কী লুভিষ্ঠে মেয়ে গো! পরের

ঘরে এমন করলে খুঁত পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেবে না ?'

কী জানি আরো কতো কী ধিক্কারবাণী জোটে তাদের ভাগ্যে। আমি নেহাৎ নিরামিষ হেঁশেলের সদস্য বলেই একেবারে ভিতর মহলে ঢুকে যেতে হতো। তাই হঠাৎ হঠাৎ এসব কানে এসে যেতো।

মিনুকে দেখে মনে হয়েছিলো অন্য জগতের কেউ।

হয়তো ও একটু বেশী সরলই ছিলো। তাই পরে বড় হয়েও বলে ফেলতো, কল্যাণীদি তোমায় যা ভালোবাসে দাদা! কী আর বলবো!—ভগবানের মতো ভালোবাসে তোমায়।

'ভগবানের মতো ভালোবাসে তোমায়।'

শুনে দিদিমা কিন্তু খিঁচিয়ে উঠে (যেটা দেখা অভ্যাস আমার) বলতেন না, 'এ আবার কী অসভ্য কথা? কথার কী ছিরি মেয়ের!' শুনতে পেলে হয়তো বলতেন, 'মেয়েটা একটা পাগল।'

আমার ছোটমামা নেহাতই আমার কাছাকাছি বয়েসের। হয়তো বছর দুই বড়। তো আমার সঙ্গে একই সঙ্গে কলেজে ভর্তি হয়েছিলো।—একসময় আমি যেমন 'হবিষ্য সাধনা' করতে স্কুলে একটা বছর পিছিয়ে পড়েছিলাম, তেমনি সেটা মেকআপ হয়ে গিয়েছিলো একবার ডবল প্রোমোশান পেয়ে।—কিন্তু ছোটমামা বেচারীকে এক বছর পিছিয়ে থাকতে হয়েছিলো, টাইফয়েডে পড়ে। অতএব মামা-ভাগ্যে এক সাথী সহপাঠী!—

কিন্তু বয়েসের দায়ে বা স্বভাবের দায়েই সে বেশ পরিণত। তাই হঠাৎ একদিন আমায় বলে বসলো, এই নারাণ, মনে রাখিস কল্যাণীরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

আমি অবশ্য আকাশ থেকেই পড়েছিলাম, ওরা কী ব্রাহ্মণ তা আমার জেনে দরকার?

ছোটমামা মুচকি হেসে বলেছিলো, সাবধান হবার জন্যে দরকার। তোদের বাড়ি মানে তোর দাদু যা কট্টর গোঁড়া তাতে বারেন্দ্র বামুন শুনলে নাক তুলবেন না?

কী আশ্চর্য! ওদের সঙ্গে ঠাকুর্দার কী সম্পর্ক?

ও আরো মুচকি হেসে বলেছিলো, মামা হই, সম্পর্কে গুরুজন। তবু বলছি—তোর সঙ্গে তো বেশ একখানা মিষ্টি মধুর সম্পর্ক গড়ে

উঠেছে বাবা। এই বেলা সাবধান হ। বিয়ে তো আর হবে না।

বিয়ে মানে ?

খুব রেগে গিয়ে বলে উঠেছিলাম, আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শ কী বসে বসে বিয়ের স্বপ্ন দেখবার ?

ছোটমামা ভারী ইয়ারমার্কা ছিলো। যদিও চরকাও কাটতো, খদ্দরও পরতো, তবু মাঝে মাঝে বলতো, দূর, এই করে আর স্বরাজ এসেছে! এ যেন বিধবার আলোচাল কাঁচকলার হবিষ্যি! তাতে গায়ে রক্ত হয় ? অবশ্যই বড়মামার সামনে নয়। আমাদের সামনে।

তো সেদিন ও হেসে হেসে বলেছিলো, তুই না দেখিস বাবা, আমি কিন্তু সে-স্বপ্ন দেখি মাঝে মাঝে !

তুমি বিয়ের স্বপ্ন দেখো ?

তা দেখি। সত্য গোপন করা পাপ, তাই স্বীকার করছি, দেখি স্বপ্ন। —আরে সময়ে বিয়ে-টিয়ে না করলে, পরে কে রেঁধেবেড়ে দেবে রে ? মা দিদি তো চিরকাল থাকবে না।

ভাত রান্নার জন্যে বিয়ে করতে হবে ?

আহা, শুধুই কী ভাত রান্না ? অসুখ-টসুখ করলেও তো— চাই আসলে—'নিজের লোক' বলে একজন থাকা খুব দরকার ! আর মেয়েলোক না হলে মায়া-মমতা করবে কে ?

সেদিন অবশ্য ছোটমামাকে খুবই খেলো ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে তো হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি, এখনো করছি ছোটমামার কথাটা কতো দামী ছিলো।

ইহসংসারে একদম 'নিজের লোক' একটা থাকা খুবই জরুরি। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো পেয়েও গিয়েছিলাম।

বি. এ-র রেজাল্টটা কেমন করে ভালোরকমের ভালো হয়ে গিয়েছিলো। দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ, ক্লাস কামাই ইত্যাদি সত্ত্বেও। 'গোলামখানার ঘরে আর পড়া নয়—' বলে কলেজে নাম কাটাতে গিয়েও কেমন যেন মায়ায় পড়ে কাটানো হয়নি। এবং সেই 'গোলাম তৈরীর' চেষ্টার ফাঁদে পা দিয়ে পরীক্ষাতেও বসেছিলাম।

তাই রেজাল্ট দেখে মা যত না খুশী হয়েছিলেন, অবাক হয়েছিলেন তার অনেক বেশী। এবং বলে উঠেছিলেন, যা বাবা,

একবার ওখানে গিয়ে ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে খবরটা দিয়ে আয়।

এখানে আসার পর এক দুবার গিয়েছিলাম, কিন্তু স্বস্তি পাইনি। সকলেই যেন কেমন দূরত্ব রেখে কথা বলেছে। আর পিতামহ? তিনি প্রণাম করার পর কেবলমাত্র বলতেন, 'দীর্ঘায়ু হও।'—যেন দীর্ঘায়ু হওয়াই জীবনের একমাত্র পরমার্থ!

উনি তীর্থবাস করে ফিরে আসার পর আর যাওয়া হয়নি।—শুধু আলস্য অথবা মনের মধ্যে বিরুদ্ধতা নয়, একটা ভয় ছিলো, পাছে আমার উপস্থিতিটি ওনাদের নিশ্চিন্ত সংসারে ঝামেলা ঢোকায়। আমার মামার বাড়িতে সবাই 'স্বদেশী করে' এবং আমিও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত। আমার উপস্থিতি বিপজ্জনক হতে পারে। ওখানেই যদি পুলিশ গিয়ে হানা দেয়।

তবু এবারে মার নির্দেশ শোনামাত্রই হঠাৎ যাবার ইচ্ছেটা বেশ জোরালো হলো। রওনা দিলাম।

কিন্তু এসে এরকম একটা দৃশ্য দেখার জন্যে কী প্রস্তুত ছিলাম? ভয় ছিলো পিতামহর সেই 'শ্বেতি' শরীরের আরো অনেকখানি জায়গা দখল করে ফেলেছে হয়তো। যদিও পাকা সোনা রঙের গায়ের চামড়ার ওপর তেমন ভয়াবহ দেখাতো না।

না, এ দৃশ্য অভাবনীয়।

দীঘির পৈঠেয় পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙেছেন জগৎনারায়ণ চৌধুরী এবং একদম শয্যাগত অবস্থায় আছেন।

ওনার আস্তানাটা ছিলো বারবাড়িতে। সেখানেই তাঁর বলতে গেলে আলাদা 'অ্যাপার্টমেন্ট'।

'শয়নগৃহ', 'অধ্যয়নগৃহ' 'রন্ধনগৃহ'।—যেখানে আমারও ঠাঁই জুটেছিল বছরখানেক।

এখন সেই শয়নগৃহে পিতামহর সর্বদার সেবিকা তাঁর চিরঅবজ্ঞার পাত্রী একবার সাতপাকে বাঁধা পত্নীটি। সেই পাকের ফেরেই রোগাপটকা বৃদ্ধা মহিলাটি এখন ওই দীর্ঘদেহী সম্পূর্ণ শয্যাগত পুরুষটির দিবসরজনীর ভারপ্রাপ্ত 'নার্স'।

দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ঠাকুমার সেবা ব্যতীত অন্য কারো সেবা নাকি পিতামহর পছন্দই

হয় না।—ওনার 'পদস্খলনের' পর স্বভাবতই ওনার পুত্ররা এবং ভৃত্যরা সেবাকার্যে এগিয়ে এসেছিলো, কিন্তু কিছুতেই ওনার মনোমত হচ্ছিলো না। সকলের কাজেই খুঁত খুঁজে পাচ্ছিলেন বড্ড বেশী।--অতএব একে একে সকলের পশ্চাদপসরণ।

অতঃপর পিসি! তবে একা মেয়েমানুষ কী করে ওই ভারী মানুষটাকে নড়াচড়া করাবে, তাই সাহায্যার্থে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো তার খুড়িকে।

আর আরও অতঃপর?

দু-দুটো গিন্নী 'বারবাড়িতে' বসে থাকলে সংসারটা ভাসতে বসে, তাই শেষ অবধি পাকে পড়ে গেলেন সেই সাতপাকে বাঁধাটি। আর দেখা গেল, পিতামহের অসন্তোষের প্রকোপের পারা অনেক ডিগ্রী নেমে গেছে।—

সেই যে মাঝে মাঝেই হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন কিছু একটা অপছন্দর হলেই, সেটা আর তেমন বেশী শোনা যাচ্ছে না।—হুঙ্কারটা উঠছে বরং সেই সময়, যখন সেবিকা কিছুক্ষণের জন্য অপর কাউকে বসিয়ে রেখে নিজের নাওয়া-খাওয়াটা সেরে আসতে যেতেন। তখনই হঠাৎ হঠাৎ তাঁর অসহিষ্ণু হুঙ্কার শোনা যেতো, এই দ্যাখ তো—মানুষটা চান করতে গিয়ে খিড়কির পুকুরে ডুবে মরলো, না ভাত খেতে বসে বিষম খেয়ে মরলো! এতোক্ষণ সময় লাগে একটা মেয়েমানুষের নাইতে-খেতে?

এসব কথা অবশ্য আমি শুনেছিলাম নিভৃতে পিসির কাছে।—পিসি অবস্থাটি বর্ণনা করে বলেছিলেন, দেখছি, খুড়িই দেখলুম সকলের থেকে মন বুঝে কাজটি করতে পারতো, তাতেই সকলে সরে এসেছি। যে জগাকে মাথার মণি করে তীর্থবাস করতে গেছলেন, তাকে তখন দেখলে জ্বলে ওঠেন। বলেন, হতভাগাটা একটু মাছি তাড়াতেও জানে না।

খুড়িকেও অবিশ্যি চব্বিশ ঘণ্টা খিঁচোচ্ছেন, তবু—একদণ্ড না দেখলেও চোখে অন্ধকার। কোথায় গেল? কী করচে? ওখানে এতো কী কাজ?—তা যাক এই শেষ বয়সেও খুড়ির একটু স্বামীসেবা করতে পেরে জীবন সার্থক হলো।

সেদিন অবশ্য শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। এর নাম 'জীবন সার্থক'। অঙ্ক মেলানো তো দারুণ শক্ত।

কিন্তু পিতামহীর মুখের জেল্লা আর জৌলুসটি তো ওই পিসির কথাই সমর্থন করছিলো। দেখেছিলাম পিতামহীর চিরঘুমন্ত আর নিভন্ত মুখের রেখায় রেখায়, যেন প্রাণের প্রবাহ।—

আমাকে আড়ালে ডেকে যখন বললেন, দেখলিতো তোর ঠাকুর্দার বুড়ো বয়েসের ধেড়েরোগ! রাতদিন হা বড়বৌ। জো বড়বৌ। যেন বড়বৌয়ের আর কোনো কাজ নেই। তখন মনে হলো ঠিক যেন কোনো সদ্যবিবাহিতা তার বোনটোনকে বলছে—দেখছিস তো তোদের জামাইবাবুর কাণ্ড! রোজ একখানা করে চিঠি চাই। কী জ্বালা বল তো।

হ্যাঁ, ঠিক সেইরকমই কপট রাগ দেখিয়ে চাপা দেওয়া উৎফুল্লতা! হ্যাঁ, সে মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল, এতোদিনে যেন সে সার্থকতার সন্ধান পেয়েছে।

এতোদিন পরে আজ ছোটমামার কথায় মনে হলো, তাহলে এই জন্যেই সময়ে কালে বিয়ে-টিয়ে করে একটা নিজের লোক মজুত করে রাখা দরকার।

এমন আপনজন বা নিজের জন, যে নাকি কার্যকারণ যাই হোক, যে কোনোভাবেই একটু সেবা করতে পেলেই 'জীবন ধন্য' বলে মনে করতে পারে। এবং ঘৃণা দ্বিধা জয় করেই সবরকম সেবা করতে পেয়েই কৃতার্থ হতে পারে।

মোটকথা এবং আসল কথা, নিজেকে 'প্রয়োজনীয়' ভাবতে পাওয়াটাই জীবনের সার্থকতা। বিশেষ করে নারীজীবনের। কারণ আমাদের এই সমাজের গড়ন এমন যে সংসারে পুরুষ জাতটার গায়ে যেন 'প্রয়োজনীয়' বলে একটা ছাপ মারাই থাকে। তা সে যে দরেরই হোক। মেয়ে জাতটার গায়ে সেই 'মূল মূল্য'র টিকিট মারা থাকে না। তাকে আপন ক্ষমতায় 'প্রয়োজনীয়' হয়ে উঠতে হয়। তাই যে উঠে পড়ে লেগে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারলো, তার ভাঁড়ারে সার্থকতার সুখস্বাদ এসে গেল। যে পারলো না, সে ফালতু হয়েই রয়ে গেল।

আমাদের পিতামহী এযাবতকাল যেন ওই ফালতুমার্কা হয়ে

কাটিয়ে আসছিলেন ! কারণ 'পিসি' দশভুজা-রূপে সংসারের দশ দিক সামলে সংসারে অতি প্রয়োজনীয়ের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন নিজেকে। কিন্তু হঠাৎই বরাতটা খুলে গেল পিতামহীর। জগৎ-নারায়ণের কোমর ভাঙার সূত্রে তাঁর এই বরাতফেরা।

জগৎনারায়ণ চৌধুরীর মতো এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি তাঁকে দুদণ্ড না দেখলে, চোখে অন্ধকার দেখছেন, এ কী কম রোমাঞ্চ ?

আচ্ছা—কিন্তু এ যুগের মেয়েরা ?

কিন্তু যুগ ভাগ করাও তো শক্ত। কোন প্রজন্মের নীচে সমাপ্তিরেখা টানা হবে ?

আমার জ্যাঠতুতো দাদাদের বৌরা তো ওই পিতামহীরই পরবর্তী প্রজন্ম। অথচ কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। অথচ কল্যাণী ?

কল্যাণী অনায়াসে বলেছিলো, রক্ষে করো মশাই, আমার ছেলেদের নামকরণের সময় তোমাদের বংশের ওই নারায়ণের ধারা টানতে হবে না। বাড়িতে একখানি নারায়ণই যথেষ্ট। তিনি তো আবার শুধু নারায়ণ নয়, একাধারে 'নরনারায়ণ'। ওতেই হবে।

কিন্তু কল্যাণীকে আমি পেলাম কখন ? ছোটমামা আমায় সাবধান করে দেবার পর তো এমন ভাব করতে লেগেছিলাম, যেন 'কল্যাণী' নামের কোনো প্রাণীকে চিনিই না। যেন জীবনে ওই নামটাই শুনিনি।

ওদিকেও নিথর পাথর ভাব।

সেও আমায় চেনে না।

এ বাড়িতে আসাটি বন্ধ করেনি বটে, তবে আসে শুধু বড়মামার কাছে কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ নিতে। আসে চলে যায়। একদিন দেখলাম মা বলছেন, 'ওরে কল্যাণী ! তুই যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিস। সবুর সঙ্গে কথা কয়েই চলে যাস !'

কল্যাণী বেশ গলা তুলেই বললো, বৃথা আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট না করাই তো ভালো টুনু পিসিমা। দাদা তো তাই বলেন।

মা বললেন, তোর দাদা আর আমার এই সবুটা, দুটোই সমান পাগল।

কল্যাণী বললো, ও'দের চেলারাও তাই।

বলেই চট করে গলা আরো তুলে বলে, মিনু এখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি ? যেন মিনুর সম্পর্কেই তার প্রধান কৌতূহল।

মনের জোর করে কদিন তো ছিলাম যা হোক, হঠাৎ ওর ও সুরেলা গলার শব্দটা শুনেই সেই বুকের মধ্যে ড্রাম পিটতে থাকে হঠাৎ মনে হয় 'বেশী মেলামেশা' না হয় না করা হলো, দু-একটা কথ বলতে দোষ কী ?

তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় নামলাম। যাতে মনে হবে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ওদের বাড়িটা তো এ বাড়ি থেকে দু-মিনিটের রাস্তা। অতএ সময় নষ্ট করা চলে না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দেখা ভঙ্গিতেই বলি, এই যে কল্যাণী, বড়মামা তোমাদের মেয়েদের ও 'রানী ভবানী' দলে জন্যে কী নির্দেশ দিলেন ?

কল্যাণী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, আপনি এখানেই রয়েছেন ন কী ? আমি ভেবেছিলাম বাড়ি গেছেন না কলকাতায় গেছেন !

ব্যস। চলে গেল গটগট করে।

দুঃখ আর যেন একটা 'অপমান অপমান' ভাবে মনটা কী রক হয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি। বলে উঠলাম, আমার কী দোষ ? ছোটমামা বললো—

কথাটা শেষ হতে পায়নি। ও দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে একট স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো। সে দৃষ্টিতে কী ছিলো ? ভালোবাসা আবেগ ? না কী তার সঙ্গে মিশানো ছিলো কিছুটা কৌতুক ? ন কী করুণা ?

তবে কথা বললো তেমনি স্থির স্বরেই। বললো, কী বলেছে আপনার পূজনীয় ছোটমামা ? ওই সাংঘাতিক মেয়েটার মুখদর্শ করিস না। করলে তোর ভবিষ্যতের বারোটা বেজে যাবে !

ঘাবড়ানো তো বটেই। ঘাবড়ে-মাবড়েই বলি, বাঃ। তা কেন বলেছে—

থাক। আর কষ্ট করে বলতে হবে না। কী বলেছে বুে গেছি। ঠিক আছে। গুরুজনের আদেশ মেনেই চলবেন।—চলি।

বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে। বলে ফেলি, কিন্তু ক'দিন আমার কী কষ্টে গেছে জানো ?

ও তেমনি কৌতুক মেশানো গলায় বললো, তাও জানি।

তাও জানো ? তাহলে ? মানে তাহলে আমার কী দোষ ?

কী আশ্চর্য ? কে আপনাকে দোষ দিতে যাচ্ছে ? ঠিকই তো, আমাদের লক্ষ্য এখন স্বাধীনতা অর্জন।—তবে—দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তো লক্ষ্যের বদল হবে ?

মানে ? তুমি কী বলতে চাইছ কল্যাণী, ঠিক বুঝতে পারছি না।

কল্যাণী খুব অবলীলায় বললো, কী বলতে চাইছি জানেন ? তখন লক্ষ্য হবে, মনের মতো একটি বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না।

বলেই হঠাৎ হি হি করে হেসে চটপট বাড়ি ঢুকে গেল।

জানি না আমি কতোক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কল্যাণী তো পরে বলেছিলো, জানলা দিয়ে দেখেছিলাম অনেকক্ষণ।—আর তারপরে জোর গলায় হেসে উঠে বলেছিলো, উঃ! কী ক্যাবলা মার্কাই ছিলে তুমি তখন।

সে সময় অবশ্য আমি বলেছি, 'তাই যদি, তো সেই ক্যাবলা মার্কার গলায় মালা দেওয়ার জন্যে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' পণ কেন ?

কেন আর ? জীবোদ্ধারের পুণ্য সঞ্চয় করতে। একটা বোকা-হাবা বেচারাকে মানুষ করে তোলবার সাধু সংকল্প।

তা সত্যি। ঝুলোঝুলিটা কিন্তু কল্যাণীর দিকেই ছিলো। বলেছিলো, ঠিক আছে। একজন মহান সাধুকে সংকল্পভ্রষ্ট করতে চাই না। শুধু তো একখানা দড়ির ওয়াস্তা। ঝুলে পড়লেই চুকে যাবে ল্যাঠা।—

এসব কবে বলেছিলো ? আমি জেল থেকে ফেরার পর ? না তার আগে ?

আগেই। জেলে যাবার সময় তো তার পেটেণ্ট হাসিটি হাসতে পারেনি। বলেছিলো, বিনা বিচারে আটক! এ জিনিস চিরকাল চলতে পারে না নারাণদা। পাপের শেষ আছেই। পাপের

প্রায়শ্চিত্তও করতেই হয় কোনো না কোনো সময়। ইতিহাস চিরকাল এই কথাই বলে চলেছে।

হ্যাঁ, 'বিদেশী প্রভুরা' শেষের দিকে, যেন 'দিন ফুরিয়ে আসছে' বুঝেই মরীয়া হয়ে উঠে শাসন চালিয়ে চলেছিলো। এলোমেলো ধরপাকড়। বিনা বিচারে আটক। পুলিশী অত্যাচারের চরম নমুনা।

বড়মামা নিয়ন্ত্রিত সেই 'রানী ভবানী' দলের মেয়েদেরকে পুলিশ একদিন এমন বেধড়ক পেটালো যে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালেও যেতে হয়েছিলো।—কল্যাণীকেও হয়তো যেতে হতো, যদি না কল্যাণীও মরীয়া হয়ে পুলিশের দিকে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে কোনোমতে একটা অচেনা বাড়ির পিছনের বাগানে ঢুকে পড়ে আত্মরক্ষা করতো। আর আশ্চর্য ওর ভাগ্য, সে বাড়ির মালিক ছিলেন একজন ডাক্তার। তেমন নামকরা কিছু নয়, ক্যাম্বেল স্কুলের পাস করা ডাক্তার বৃদ্ধ মানুষ, অতি সজ্জন। তিনিই প্রায় অচৈতন্য কল্যাণীকে ওখান থেকে আবিষ্কার করে এবং তার 'ইতিহাস' শুনে সযত্নে নিজের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন আশ্রয় দিয়ে আর—স্বামী-স্ত্রী দুজনে মেয়েটাকে যত্ন-আত্তি করে সারিয়ে তুলে নিজেরা সঙ্গে করে সেই দূরবর্তী পাড়া থেকে কল্যাণীকে তার বাড়ি পোঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।—সে পরিচয়ের সূত্র আজও বহন করে চলেছে কল্যাণী।—ডাক্তার ভদ্রলোকের একটি ছেলে তখন কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র।—সেই হচ্ছে ওই রিচি রোডের 'নীলোৎপল'।

ডাক্তারের নাকি ঈষৎ বাসনা হয়েছিলো, ওই তেজী মেয়েটাকে ছেলের বৌ করেন। কিন্তু মেয়েটা নাকি তার আভাস শুনে বলে বসেছিলো, এমা! আমার যে একটা বাউন্ডুলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে!

বিয়ে হয়ে গেছে!

স্তম্ভিত দম্পতি বলেছিলেন, তাহলে তোমার মাথায় সিঁদুর নেই কেন?

সিঁদুর পরা মেয়েদের যে ওই 'রানী ভবানী দলে' নেয় না

মাসীমা।—আর তারপরে কিনা হেসে হেসে বলেছিলো, আমার কপাল। কোথায় আপনাদের মতো এমন গুরুজন পেতাম, ভালো ডাক্তার পাত্র জুটতো, তা নয়-একটা শৈশবে বাপ মরা, মা থেকেও না থাকা বেকার বাউণ্ডুলে! 'ঘরই' জুটবে কিনা কে জানে!

মহিলা অবাক হয়ে বলেছিলেন, কিন্তু এরকম বিয়ে তোমার কে দিয়েছিলো বাছা?

কল্যাণী খুব গম্ভীরভাবে বলেছিলো, ওই আপনারা যাকে বলেন, 'নিয়তি'! তিনিই আর কী।

অবশ্য মহিলা বেশীক্ষণ বোকা থাকেননি। বলেছিলেন, বুঝেছি। তোমাদের এই দলেরই কোনো ছেলেকে নিজে নিজে বিয়ে করেছ। তাই না?

তখন অবশ্য কল্যাণীর মতো ডাকাবুকো মেয়েকেও মাথা হেঁট করতে হয়েছিলো।—তদবধি কল্যাণী নীলোৎপল গাঙ্গুলিকে ভাই-ফোঁটা দিয়ে আসছে। এখনো দেয় সেই বুড়ো হয়ে যাওয়া ডাক্তারটিকে।

ক'দিন পরে হারিয়ে যাওয়া কল্যাণীকে পেয়ে তাদের বাড়িতে আনন্দের বান ডেকেছিলো। তবে আমার ভাগ্যে আর তার শরিক হওয়া হয়ে ওঠেনি। আমি তখন হাজতে! বড়মামা আর আমি দুজনই।

বড়মামার একটা ছোট্ট প্রেস ছিল। নেহাতই ছোট্ট, হাতে করে করে অক্ষর সাজিয়ে ছাপা হতো। সেখান থেকে একটা অতি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক বেরোতো, নাম 'সংগ্রামী'। যে কাগজের সম্পাদক সর্বেশ্বর রায় আর মুদ্রাকর নরনারায়ণ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো 'ভারত রক্ষা' আইনে।—

সেখান থেকে চালান করা হয়েছিলো বহরমপুর জেলে।—ক' বছর পচাতো কে জানে! সেখান থেকে হয়তো অন্যত্রও চালান করতো, কিন্তু—পরিস্থিতি ঘুরে যাচ্ছিলো তখন। ছোটমামা একদিন দেখা করতে এসে—

দাদু আপনার চা!

খ্যানখেনে একটা গলার স্বর যেন হঠাৎ ধাক্কা মেরে আমার দূরবীনটাকে ছিটকে ফেলে দিল।

এদের এই কাজের মেয়েটার গলার স্বরটা কী বিশ্রী খ্যানখেনে। এতোটুকু বয়সের মেয়ের এরকম স্বর!—ওর কথা শুনলেই আমার জঙ্গীপুরের 'সরকার ঠাকুমার' কথা মনে পড়ে যায়।

পাড়াতুতো ঠাকুমা ওই সরকার গিন্নী, ভোরবেলা পুকুরে নামতেন, আর পড়ন্ত বেলায় পুকুর ছেড়ে উঠতেন, যখন আর কেউ বিশেষ থাকতো না পুকুর ঘাটে, ওনার গায়ে জলছিটিয়ে ফেলে অশুদ্ধ করে দিতে। রাম শুচিবাই সেই বুড়ি সকাল থেকে সারাদিন ওই এক খ্যানখেনে গলায় পাড়াসুদ্ধ সকলের মুণ্ডপাত করে চলতেন।——

ওই দিল! চান করে উঠে যাচ্ছি, এখন গায়ে জল দিয়ে মোলো।—আ মোলো যা! দিলি তো ছুঁয়ে?—এসব আপদদের কেন মরণ হয় না গো!

এই—মেয়েটা এমন সুন্দর একটা কথা বললো। বললো 'দাদু আপনারা চা!'—অথচ আমার কিনা সেই আধপাগলী সরকার ঠাকুমার কথা মনে পড়ে গেল! আশ্চর্য! অথচ মেয়েটা বেশ ভালোই।

সুর, স্বর, গন্ধ এই তিনজনা ভারী আলটপকা বহুদূরবর্তী অতীতকেও সামনে এনে ফেলতে পারে।

বললাম, তুমি আমার ছেলেকে বলো 'দাদাবাবু' আর আমায় বলো 'দাদু'! ভারী মজা তো।

ও অনায়াসে বললো, 'বুড়োদেরকে আবার 'দাদু' ছাড়া কিছু বলা যায় না কী?'

একটি যুক্তি।

কিন্তু চা-টা আবার ঘরে নিয়ে আসা কেন? আমি তো যাচ্ছিলামই।

তখন আমি আমার মেজছেলের বৌয়ের সেই মাজাঘষা সুরেলা গলাটি শুনতে পেলাম।—এ পেয়ালাটা তো ফাউ বাবা। এর জন্যে আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন? আমিও করি না। টেবিলে গিয়ে জমিয়ে বসে আসল চা-টি তো খাওয়া হবে আপনার পুত্ররত্নটি ফিরলে।

কাজের মেয়েটার হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে নিজে ঘরের একটা বেতের মোড়ায় বসে পড়ে হঠাৎ বলে উঠলো, আচ্ছা বাবা, আপনি তো একসময় স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন ?

এ হেন প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম, হঠাৎ এ কথা ?

কারণ আছে। বলুন না ছিলেন তো !

আমি হেসে ফেলি। বলি, 'স্বা-ধীনতা-সংগ্রামী' ! বাপরে ! অতোখানি গালভরা নামের যোগ্য-টোগ্য নই বাবা।

বাঃ কেন নয় ? জেলেটেলেও তো গিয়েছিলেন ?

ওই একবারই ! তাও মেয়াদ ফুরোবার আগেই ভাগ্যক্রমে ছাড়া পাওয়া।

তাতেও হয়।

কৌতূহলী না হয়ে পারি না। বলি, কী হয় ?

'কী হয়' তা শুনি ওর মুখে। শুনে বলতে কী হতভম্বই হই ওই স্বাধীনতা সংগ্রামী শব্দটার খোলসে নামটাকে একবার মুড়ে নিয়ে আর জেলে যাওয়ার প্রমাণপত্রটি ভালো করে গুছিয়ে-গাছিয়ে পেশ করে একটা দরখাস্ত করে ফেলতে পারলেই আমি না কি সরকার থেকে একটা 'ভাতা' পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবো !

কী কী কথা হয়েছিলো আমার পুত্রবধূর সঙ্গে সবটা মনে পড়ছে না, তবে কখন যেন একবার বলে উঠেছিলাম, 'ছিঃ !'

তারপর অবশ্য আমার বৌমা আর কিছু বলেনি। শুধু ঘর থেকে চলে গিয়েছিলো। আর যাবার সময় বলে উঠেছিলো, এইসব অর্থহীন সেণ্টিমেণ্টই আমাদের দেশকে খেয়েছে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গে কী সেইখানেই 'ফুলস্টপ' পড়েছিলো ?

তা পড়েনি আবার পূর্ণোদ্যমে উঠে এসেছিলো চায়ের টেবিলে। মেজছেলে তার 'স্টকে' অনেক জোরালো জোরালো যুক্তি ভরে এনেছিলো।

তবে এসেই প্রথমটায় নয়। এসে হাস্যবদনে বলেছিলো, আজ চায়ের সঙ্গে 'টা'-টি কী ? ওঃ ফার্স্ট ক্লাস। এ'চোড় ঢুকিয়ে দিয়ে এই চপটা যা বানায় বাবলি ! বলে, মার কাছ থেকেই নাকি রেসিপিটা

নেওয়া। তো মা তো বড় একটা—আসলে মায়ের স্বভাবটাও তো জানোই? খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী সময় দেওয়াকে মা মনে করে সময়ের অপচয়!

তখনো আমি জানি না, সেই 'প্রসঙ্গ'টি মাথার ওপর দোদুল্যমান। তাই নিশ্চিন্তেই বলি, তা সত্যি। তোদের মা বরাবরই বলে, ছেলে-পুলেকে ভালো জিনিস খাওয়াবো, নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবো, তবে হাজার রকম ফিরিস্তি বানিয়ে, সময়ের অন্যায় অপচয় করে নয়। সে হয়তো দৈবাৎ একদিন।

ঠিক তাই। মনে হচ্ছে দৈবাৎই হয়তো এক-আধ দিন মায়ের হাতে খেয়েছি জিনিসটা।—বাবলির আবার অন্য মত। ও বলে, সময় তো কতোভাবেই নষ্ট করা হয়। রান্নাবান্নায় নতুন নতুন এক্সপেরিমেণ্টের সুখলাভ করতেই—

ইস। আবার আমি এইরকম কুচুটে মনোভাবে ভাবছি। সত্যি কী মুশকিল! যে 'যা কিছু' করে অথবা বলে, আমার মনের মধ্যে কেন তার একটা অন্য ব্যাখ্যা ফুটে বসে। খুব খারাপ।

তবে অবশ্যই অভদ্রের মতো সেটা ব্যক্ত করে বসি না। বরং সমর্থনসূচক কিছু বলে উৎসাহই দিই। তাই বললাম, তা ঠিক। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়াটি ভালো হলে, সর্বদাই সবসময় তাতে বৈচিত্র্যের আর শৌখিনতার টাচ্ থাকলে মেজাজ শরিফ থাকে। কী বলো বৌমা, ঠিক বলিনি? হা হা করে খানিকটা হেসেও দিয়েছিলাম তার সেই তখনকার মুখের মেঘটুকুকে স্মরণ করে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। মেজছেলে এই প্রসঙ্গটি তুললো। —আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছে। অনেকগুলো কাগজপত্র ফর্ম ইত্যাদি নিয়ে টেবিলে বিছিয়ে ধরে একদম বিনা ভূমিকায় বলে ওঠে, বাবা! তোমায় গোটাকতক সই করতে হবে। এখন করবে? না রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ধীরেসুস্থে?

চড়াত করে মাথায় এসে গেল, আর কিছু নয়, সেই ব্যাপার। তবু অবোধের ভাবে (মানে আমিও তো কম ফিচেল নয়) বললাম, গোটা ক-ত-ক কিসের রে?

ও বললো, এই যে দেখো না। দেখলেই বুঝতে পারবে। একটা

সরকারি ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে। ওই যে সামনের ব্লকের মিস্টার হাজরার বাবা, কী যেন নাম, ভবরঞ্জন হাজরা না কী, উনি তো দিব্যি একখানি 'ভাতা' বাগিয়ে ফেলেছেন।

হঠাৎ মনে হলো, 'আমার ছেলের ভাষাটা কী অশালীন'। কিন্তু সে কথা তো বলে ওঠা যায় না। তাই ছেলে তার সেই নিজস্ব ভাষাতেই কথা বলে চলে, মাসে চারশো ষাট করে পাচ্ছেন। বোধহয় কোয়র্টারলি ব্যবস্থা।—যাই হোক ওইরকমই একটা অংক হবে। তবে মিস্টার হাজরার মুখে শুনলাম, এই 'ফ্রিডম ফাইটারের ভাতা' একটি যোগাড় করতে, অনেকের অনেক সময় বহুত কাঠখড় পোড়াতে হয়, কিন্তু ওখানে তেমন কিছু করতে হয়নি। মিস্টার হাজরার শ্বশুর-বাড়ির দিকে এ সম্পর্কে একটা ভালো সোর্স আছে। মানে খাতির-টাতির আছে আর কি ওপরওলাদের কারো সঙ্গে। কাজেই সহজেই সহজেই হয়ে গেছে। তাই উনিই বলছিলেন—

আমি বুঝতে পারছি প্রবুদ্ধ যেন তড়বড়িয়ে একটু বেশী কথা কইছে। তার মানে ভিতরে বোধহয় কিঞ্চিৎ নার্ভাস হয়ে গেছে।—সেই তখন—বাবলির সামনে আমার 'ছিঃ' উচ্চারণটি ওর কর্ণগোচর হয়নি, এমন তো হতে পারে না। তবে আমি ঠিক করছি, চট্ করে রেগে উঠবো না, এবং ওধরনের অভিব্যক্তিও আর দেখাবো না। দেখি ছেলে কতোটা কী বলে!

এখন ওর কথার মাঝখানে ওই 'ড্যাশ' টানার অবকাশটুকুতে বলে ফেললাম, এতো সব কাঠখড় পোড়াপুড়ি করতে হয় না কী? জানতাম না কী? ভাবতাম সরকার থেকেই ওনাদের খুঁজেপেতে ডেকে এনে—

আমার ছেলে আমার বালসুলভ অবোধতায় হেসে উঠলো। বললো, 'খুঁজেপেতে ডেকে এনে'—হুঁ! আছো কোথায়? তাছাড়া অ্যাপ্লাই না করলে সরকার জানবে কোথা থেকে, কোথায় কোনখানে একদার কোন 'পলিটিক্যাল সাফারার' পড়ে পড়ে ধুঁকছে।—ইয়ে মানে আর কী অনেকেরই তো যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে।—যাঁরা লড়তে লড়তে মরেটরে গেছলেন, তাঁরা তো শহিদ হয়ে গিয়ে অমর হয়ে বসে আছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁদের নাম উঠে গেছে।

কিন্তু যে সব বেচারারা টিকে থেকেও কিছু করে উঠতে পারলো না, না পেলো মন্ত্রিত্ব, না পেলো গদি-টদি, তাদের জন্যে কী কিছুই দায়িত্ব নেই সরকারের ? তো সেটাই মনে পড়িয়ে দেওয়া আর কী !—

—অন্য এক এক দিনের মতো আজও ভাবলাম, ছেলেটা এতো সব চৌকস কথা শিখলো কবে ?

এখন আমি আবার তেমনি 'বালকের' গলায় বললাম, হ্যাঁ, আমিও তো সেই কথাই বলেছিলাম—দায়িত্বটা তো সরকারেরই ।

ছেলে কী ভেবে দু-কুল বজায় রাখা সুরে বললো, তা সে দায়িত্ব যে সরকার একেবারে পালন করছে না, তা তো নয় । এই তো ডেকে এনে তাম্রপত্র-টত্র দিচ্ছে । সংবর্ধনা জানাচ্ছে । তবে ওই যা বললাম, কে কোথায় হারিয়ে গিয়ে, কোথায় পড়ে রয়েছে, জানবে কী করে সরকার ? তাই জন্যেই তো এইসব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম-টর্ম ।—ফর্মটি নিখুঁত নির্ভুলভাবে পূরণ করে দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়ে, ঠিক জায়গায় গিয়ে ধরতে পারলেই 'প্রমাণ করাকরি' নিয়ে বিশেষ ঝামেলা করতে হয় না । তো মিস্টার হাজরার সেরকম ধরাধরির লোক রয়েছে বলেই, উনি নিজে থেকে আমায় এই ফর্ম-টর্মগুলো গাছিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার বাবাকে দিয়ে ঠিকমতো 'ফিল্ আপ্' করিয়ে আনুন । তারপর আমি দেখছি ।

প্রবুদ্ধর এই ভাষ্যটির মধ্যে কতোটা দুধ আর কতটা জল তা না বুঝতে পারার মতো বুদ্ধু অবশ্যই নই আমি । তবু সেই বুদ্ধু ধরনের ভূমিকাই চালিয়ে যাই । বলি, আমার কথা আবার ও ভদ্রলোক জানলো কোথা থেকে ?

জানলো কোথা থেকে ? বাঃ । বাবাঃ আমি, আমরা গল্প করিনি আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে ?—প্রবুদ্ধ উদ্দীপ্ত হয় । তুমি আমাদের কতো বড় একটা গৌরব ।—ওরা তো শুনে আশ্চর্যই হয়ে গেছলো । বলে, আশ্চর্য । দেখলে বোঝা যায় না । ওঁর এধরনের একটা 'পাস্ট হিস্ট্রি' আছে ।—তো যাক—এখন না হয় থাক, রাত্রে ধীরেসুস্থে—

এখন আমি আত্মতাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম, আরে দূর ! ভারি আবার একটা 'পাস্ট হিস্ট্রি' ! সেই যে বলে—'কবে ঘি খেয়েছিলাম'

এও তো তাই। দিব্যি বিয়ে-টিয়ে করে সংসার পাতিয়ে বসে জীবন কাটাচ্ছি—খাচ্ছি পরছি—

এতোক্ষণ বাবলি মুখে 'রা' কাড়েনি। এখন ওর নিজস্ব আত্মস্থ ভঙ্গিতে বললো, তা-হলেও একসময় যথেষ্ট স্যাক্রিফাইস করেছেন। জেলটেলও খেটেছেন। পুলিশের পিটুনির দাগ এখনো শরীরে স্থায়ী হয়ে আছে, এর বিনিময়ে আপনার কী কিছু প্রাপ্য নেই?

আমি একটু হাসলাম। বললাম, স্যাক্রিফাইসের কী আর বিনিময় থাকে? তবে যদি বলো, যার জন্যে লড়ালড়ি তা সেটা তো মিলেছে! দেশের পরাধীনতা তো মোচন হয়েছে। যে পথেই হোক, সেটাই তো যথেষ্ট পাওয়া।

বাবলি আর তার বর দুজনেই একটু থমকালো। তারপর বাবলিই হাল ধরলো। বললো, তাহলেও এটা যখন নিয়ম রয়েছে, সরকার থেকেই এই 'ভাতা'টা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, তখন রিফিউজ করার কোনো কারণও তো দেখি না। নিচ্ছেনও তো অনেকেই। তাঁদের পক্ষে তাহলে যুক্তি কী? তা বলুন?

না আমার ছেলে অনেক চৌকস কথা শিখলেও এমন ধীরভাবে আত্মস্থ গলায় কথা বলতে পারে না। তড়বড়িয়ে বলে ফেলে।

আমিও আমার ছেলের বৌয়ের ভঙ্গিতেই বললাম, কে কোন যুক্তিতে চলে, তা কী বোঝা যায় মা? তবে আমার বাপু ওই একটাই যুক্তি! 'বিনিময়' কিসের! ব্যক্তিগত কোনো প্রাপ্তির আশায় তো সেদিন কেউই লড়তে নামেনি।

আমার ছেলে বুঝলো, সুতো ছিঁড়েই যাচ্ছে। 'তবু চেষ্টা' হিসেবেই বোধহয় বললো, তা ফ্রন্টে যুদ্ধ করে ফেরা সোলজাররাও তো কিছু 'পেনসন' পায়। সেই হিসেবেই দেখা যায় একে। এই কটা সই করে ছেড়ে দিলেই মাসে মাসে শ' পাঁচেক টাকা পেয়ে যেতে পারো তুমি। প্লাস সারা ভারতের রেলপথের একখানি 'পাস'। মিস্টার হাজরার বাবাও সেটা পেয়েছেন। এমন সুযোগ ছাড়বেই বা কেন? এতে তো আর সরকার ফেল্ মেরে যাচ্ছে না! আর অন্য কারুর প্রাপ্য পাওনাতে থাবা বসানো হচ্ছে না! টাকা জিনিসটা একেবারে ফেলনাও নয় বাবা!

আমি হাসলাম। বললাম, তোদের সঙ্গে যুক্তিতে পেরে উঠি এমন কী সাধ্যি? তোরা হয়তো ঠিকই বলছিস—(মনে মনে অবশ্য বলি না 'ঠিক বলছে') তবে কী জানিস? ব্যক্তিগত কিছু রুচি, চিন্তা, সেণ্টিমেণ্ট এসবগুলো তো থাকেই। কাজেই—

ইচ্ছে করে নয়, প্রায় অজ্ঞাতসারেই আমি টেবিলে বিছানো সেই কাগজপত্রগুলো একটু ঠেলে সরিয়ে দিই।

ওঃ। তার মানে তুমি একেবারে ঝেড়ে জবাব দিচ্ছ? একটু ভেবে দেখবার প্রশ্নও নেই? ঠিক আছে। মিস্টার হাজরার কাছে বোকা বনে যেতে হবে এই আর কি!—প্রবুদ্ধ চেয়ারটাকে শব্দ করে ঠেলে উঠে পড়ে ঘরে চলে গেল।—পিছু পিছু বাবলিও গেল। তবে ওর মতো সশব্দে নয়। ধীরেসুস্থে কাগজগুলো গুছিয়ে তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে আর একবার সেই তখনকার মতো মিহি সুরেলা গলায় বলে গেল, বলেইছি তো অর্থহীন সব সেণ্টিমেণ্টই আমাদের খেয়েছে।

আসলে দুজনেই একটু 'ঘা' খেয়েছে। বোধহয় ভেবেছিলো, চেষ্টাটেষ্টা করে আমার এমন একটা 'প্রাপ্তিযোগের' ব্যবস্থা করে ফেলায় আমার কাছে অভিনন্দিত হবে। তা নয়, উল্টো ব্যাপার।

ধরেই নিচ্ছি, এরপর রাতের 'ডিনারের' কালে একটি নিঃসীম নীরবতা বিরাজ করবে, এবং অতঃপর কাল থেকে একটা থমথমে ভাব এসে যাবে। কারণ শুধু তো অভিসন্ধি পূরণে ব্যর্থ হওয়াই নয়!—আঃ! ছিঃ! আমার মনের ভাষাটা যেন মাঝে মাঝে বড়ো রাফ হয়ে যায়। 'অভিসন্ধি' বলাটা অ-সভ্যতা। বড়জোর বলা যেতে পারে অভিলাষ।—অভিলাষ একটা করেছিলো, আমি অকারণ তাতে বাদ সাধলাম। ওই ব্যর্থতার মধ্যে কোনখানে যেন একটু 'অসম্মান অসম্মান' ভাব অনুভব হচ্ছে ওদের। তা সে আমাকে যতই 'বোকা সেণ্টিমেণ্টাল' বলে বিদ্রূপ করুক। অর্থাৎ আমি যেটাকে বেশ 'দামী' বলে মনে করে আগ্রহান্বিত হচ্ছি, অপর কেউ যদি সেটাকে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে, অপমানবোধ আসবেই।—কিন্তু কী করবো? আমার পক্ষে যেটা সম্ভব নয় সেটা—সেই যে একদিন—না, সে তো এখানে নয়। আর একালেও নয়। এই নরনারায়ণ চৌধুরীর তখন

মাথাভর্তি কোঁকড়া প্যাটার্নের ঠাসবুনুনি ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশ। পিতামহ শয্যাগত, পিতামহীর সেখানেই হামেহাল উপস্থিতি।— এমতাবস্থায় একবার আমাদের সেই জঙ্গীপুরের বাড়ির দোতলায় একটা কোণের দিকের ঘরে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে পিসি চুপিচুপি বলেছিলো, কাকা বেঁচে থাকতে থাকতেই ছেলে-বৌরা তলে তলে সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে সরাচ্ছে, বুঝলি। তুই-ই শুধু ঠকে মরলি। তেজ করে নিজের পড়ার ঘর পর্যন্ত নিলি না, ভরণপোষণের খরচাও দাবি করলি না। তো তোর বাপের কী ভাগ নেই? এইগুলো নিয়ে যা দিকি এবার?

পিসি একটা বড়সড় লাল শালুর থলি আমার হাতে ধরিয়ে দিতে এসেছিলো।

পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, কী এ?

গিয়ে খুলে দেখিস। তবে তোর নেয্য ভাগের সামান্যই। জানিস এই মস্ত সিন্দুকটা ভর্তি রুপোর বাসন ছিলো। গুষ্ঠিবর্গের বিয়ে-থাওয়া ভাত-পৈতেয় 'দান-পাওনা' তো ছিলোই, তাছাড়া আরও ছিলো পুজোর ভোগরাগের বাসন। বিশেষ বিশেষ পুজোপাঠের দিন বার করা হতো, তো কাকার এই দুরবস্থা ঘটায় সে সবই তো প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আবার খুড়িও অষ্টপহর পতিসেবায় ব্যস্ত। কাজেই লুটে-পুটে সরিয়ে ফেলার পরম সুযোগ। তুই তো চিরহারা। তুই ফাঁকেই পড়বি, তবু একটাই নিয়ে যা!

বলেছিলাম, পিসি, তোমার মাথাটা দেখছি একেবারেই গেছে।

কেন? মাথা খারাপের কী দেখলি? এতে তোরই বাপের জিনিস-টিনিস আছে। বিয়ের সময় দানে পাওয়া রুপোর ডিবে, গেলাস, বাটি, রেকাবি, আতরদান। আর 'তার' হাতের চার-পাঁচটা ভালো ভালো আংটি। আর মোটা বিছেহারের প্যাটার্নের সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন। আমি কিছু কিছু সরিয়ে রেখেছিলাম বলেই এখনো ওনাদের 'গর্ভে' যায়নি। নচেৎ চলে যেতো। তবু বড় বড় কিছু তো দিতে পারা যাচ্ছে না। সকলের অলক্ষ্যে নিতে হবে তো? এক কাজ কর, এইবেলা তোর জামাকাপড়ের পোর্টম্যান্টোর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখগে যা।

গ্রামের বাড়িতে দিনের বেলাটায় সাধারণত বড় কেউ ওপরতলায় ওঠে না। সেই সকালে নেমে যায়, রাতে শুতে আসে। কুচোকাচাদের জিনিসপত্র কাঁথা বিছানা, সব নেমে পড়ে সকালে। দাসদাসীরা ঘরদালান সাফসুতরো করে, ঘরে ঘরে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চলে যায়। কাজেই পিসির এই কার্যকলাপের কোনো সাক্ষী ছিলো না, আমি বাদে।

আমিই অতএব বললাম, জিনিসগুলো যেখানে যেমন ছিলো, তুলে রাখোগে পিসি।

যেখানে যেমন ছিলো তুলে রাখবো? কবে থেকে এসব গুছিয়ে গুছিয়ে তোর জন্যে তাঙড়ে মরছি। 'দেখি কবে সুযোগ পাই' ভেবে ভেবে। তো এখনো যদি নিয়ে যেতে না চাস, আবার কবে সুবিধে হবে? তুই কী নিত্যি আসছিস এখানে?

হেসে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম, 'সুবিধে' না হলেই বা কী পিসি? ওগুলো ছাড়াই তো জীবন বেশ কেটে যাচ্ছে। বাকি জীবনটাও যাবে।

পিসির গলা সুরেলা ছিলো না। খটখটে গলা। বলেছিলো, এই ভয়ই করেছিলাম। মহাপুরুষের অবতার যে! তো বলছি নিবি নাই বা কেন? এখন দরকার নেই। পরে হতে পারে। এতে তো কোনো দোষ লজ্জা নেই। সবই তোর 'হক'-এর ধন।

মনে হচ্ছে তার উত্তরে বোধহয় বলেছিলাম, 'হক'-এর ধন তাহলে? সেটা চুরি করে নিয়ে যাবো?

পিসি রেগে উঠে বলেছিলো, চুরি আবার কী? পাঁচ কান হলেই হয়তো কাকার কানে গিয়ে উঠবে। ওদের কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে। মনে মস্ত ঘা খাবেন মানী মানুষটা। হয়তো তা থেকেই মৃত্যু 'ত্বরান্বিত' হবে। এইসব ভেবেই চুপিচাপি। ভারী জিনিস তো কিছুই দিতে পারলাম না। তোর মা তো ন্যাড়া গায়ে বিদেয় হয়ে গেছলো। তোর তার দরুন গহনা-টহনা তো এখনো কাকার সিন্দুকে। চাবি ওনার পৈতেয়। তো সে সব গহনাপত্তর তো তোরই প্রাপ্য। কাকা গত হলে আর তুই পাবি? ভগবান জানে। সংসারের যা মতিগতি দেখছি। সবই হয়তো বেপাত্তা হয়ে যাবে। এ কটা না হয় বাপের

স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই নিয়ে যা। চারদিকে কাক চিল ইঁদুর-আরশোলা কে কখন গ্রাস করে বসে, আমি আর কতো আগলাবো?

চারদিকে কাক চিল ইঁদুর আরশোলা!

মনে আছে পিসির সেই অনায়াস উক্তিটিতে প্রায় বিদ্যুতাহত হয়ে গেছলাম।—শৈশব বাল্যের একটানা স্মৃতি এবং তার পরবর্তী কাজের মাঝে মধ্যের স্মৃতিতে তো এমন একটা গায়ে কাঁটা-দেওয়া অবস্থার কথা মনে পড়ে না।

জ্ঞানাবধি জানতাম, আমরা সকলেই অর্থাৎ এ বাড়ির ওপর থেকে নীচে সবাই একটি জবরদস্ত সিংহের থাবার মধ্যে কব্জা হয়ে পড়ে আছি।—এক হিসেবে আমরা সবাই 'স্ব-জাতি'। বড়জ্যাঠা থেকে জগুদা পর্যন্ত। ঠাকুমা থেকে মানদাদি পর্যন্ত। সবাই 'এক জাতি এক প্রাণ'।

এদের মধ্যে যে আবার কেউ কেউ 'কাক চিল ইঁদুর আরশোলা' থাকতে পারে, স্বপ্নের কোণেও ছিলো না।

অথচ পিসির কথা শুনে মনে হয়েছিলো, পিসির জানা ছিলো।—কী অদ্ভুত! কী ভয়ানক! কী আশ্চর্য!—

—পরে অবশ্য দেখেছি আশ্চর্য নয়।

একদা—এই আমরা ভারতভূমির সদস্যবৃন্দ। আসমুদ্র হিমাচল, ব্রহ্মদেশ থেকে পুলিপোলাও পর্যন্ত (আন্দামানের ওটাই তো ছিলো ডাকনাম, 'পুলিপোলাও') সবাই পিষ্ট হয়ে পড়ে থেকেছিলাম এক জবরদস্ত সিংহের থাবার মধ্যে। তখন জানতাম আমরা সবাই এক জাতি, এক প্রাণ। সিংহটার থাবার তলা থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিলো সকলের লক্ষ্য। এর মধ্যে যে কোনো কাক চিল থাকতে পারে কেউ ভাবেনি।

তো সিংহটার বিদায় ঘটিয়ে প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি সেটা। চারিদিকে—'কাক, চিল, শকুনি, শেয়াল, ইঁদুর, আরশোলা, সাপ, বিছে।' সদাই তটস্থ হয়ে থাকা, কে কখন কোনদিক থেকে ঠোকরায়, কামড় বসায়, তলে তলে কাটে।

তো সেদিন তো এমনটা জানা ছিলো না। তাই অবহেলায় বলেছিলাম, আরে বাবা, 'স্মৃতিই' নেই, তা স্মৃতিচিহ্ন। বলে হেসে-

ছিলাম।

মনে আছে পিসির সেই ভালোবাসাভরা হিত উপদেশটি গ্রহণ করিনি বলে, থমথমে হয়ে গেছলো পিসি। রাতে খাবার সময় কাছে এসে বসলো না। সকালে বেরোবার সময় পুজোর ঘরের মধ্যে বসে থাকলো।—দরজার চৌকাঠে প্রণাম ঠেকিয়ে চলে এলাম—অস্ফুটে একটু বোধ হয় 'দুর্গা দুর্গা' শুনেছিলাম। বাক্যালাপ হলো না আর।

অথচ অন্য অন্য বারে পিসি বাড়ির দেউড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠ পর্যন্ত এগিয়ে আসে বিদায় জানাতে। আর সাত-দশবার আমার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে ঠোঁটে ঠেকায়, আর কাতর মিনতি জানায়, 'আবার তাড়াতাড়ি আসিস মানিক!'

মনে হয়েছিলো, পিসি আমার ওই প্রত্যাখ্যানে ক্রুদ্ধ হয়নি, হয়েছিলো অপমানাহত। সে আপ্রাণ আগ্রহে আমার 'ভালো' করতে চেষ্টা করেছিলো। অথচ আমি সেটা হেলায় ঠেলে ফেলায় মনে 'ঘা' লেগেছিলো।

আসলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি আর প্রকৃতি অনুযায়ী ভালোবাসে এবং ভালোবাসা প্রকাশ করে। ভালোবাসার পাত্রটার 'রুচি, পছন্দ, প্রকৃতি', এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

পিসির ওই নীরবতার অস্বস্তি একটু হয়েছিলো অবশ্যই। তা বলে ওনার প্রস্তাব তো মেনে নেওয়া যায় না। তবে সেদিন চলে আসার সময় একবারও ভাবিনি পিসির সঙ্গে আর দেখা হবে না। তবে, সেদিন চলে আসার সময় একবারও ভাবিনি পিসির সঙ্গে আর দেখা হবে না। অথচ সেই অভাবিত ঘটনাটিই ঘটে বসেছিলো।—আমার সেই মৃত্যুপথযাত্রী পিতামহ এবং জন্মরুগ্ন পিতামহীটি বেঁচে থাকতে থাকতেই শক্তপোক্ত স্বাস্থ্য, খটখটে শরীর, জন্মে কখনো কেউ যার মাথাটি ধরতে দেখেনি, 'বাররত'র ছুতোয় পরপর তিন-চার দিন উপোস করেও যে সমান তালে খটখটিয়ে বেড়িয়েছে, সেই পিসি নাকি একদিন বিনা নোটিশে হঠাৎ হার্টটাকে ফেল করে বসেছিলো।

কিন্তু সে খবর কী আমি তখন তখনই পেয়েছিলাম? নাঃ। বাড়ির কেউ 'গা' করে আমায় সেটা তৎপর হয়ে জানায়নি। কেনই-বা তৎপর হবে? পিসির জন্যে তো আর 'অশৌচ' লাগবে না আমার।

ওই 'অশৌচ' লাগার কারণেই দুঃসংবাদকে তাড়াতাড়ি পরিবেশন করতে হয়।

পিসি এই জঙ্গীপুরের চৌধুরীবাড়িতে জীবন পাত করে গেল, কিন্তু তার জন্যে এ বাড়ির কাউকে কিছু করতে হলো না। কারোর ভোগরাগের এতোটুকু ব্যতিক্রম ঘটেনি।—বেওয়ারিশ পিসির নামকা ওয়াস্তে একটা শ্রাদ্ধ পিণ্ডি দেবার জন্যে নাকি তার চিরঅচেনা শ্বশুর-বাড়ির গুষ্ঠীর একটা গেঁজেল জ্ঞাতি দ্যাওর না ভাসুর কার ছেলেকে আনানো হয়েছিলো খরচপত্তর দিয়ে। ওইটুকুই প্রাপ্তিযোগ ছিলো ওই চৌধুরীবাড়ি থেকে।

এই নাকি নিয়ম। এই আমাদের শাস্ত্রোক্ত বিধান।—পরে এসব জেনেছি আমি।—

কিন্তু ওই শাস্ত্রীয় নিয়মেই যাঁদের জন্যে এই নরনারায়ণ চৌধুরীর রীতিমতো অশৌচ পালনের ব্যবস্থা, তাঁদের স্বর্গারোহণের খবরটিই কী তড়িঘড়ি পেয়েছিলো ছেলেটা?

নাঃ, তাও পায়নি।

কী করে পাবে? জেলখানার লোহার গরাদ ডিঙিয়ে খবর পৌঁছনো কী সোজা কথা? খবরটা যখন ছেলেটার কানে পৌঁছেছিলো, তখন ওইসব পালনের কালাকাল আর ছিলো না।

হ্যাঁ, বহরমপুর জেলে বসে যখন একদার জবরদস্ত সিংহ জগৎ-নারায়ণ চৌধুরী ও তস্য পত্নীর লোকান্তরের খবর পেয়েছিলাম, তখন অশৌচ পালনের কালটাল কেটে গেছে। তবে আর করবার কী ছিলো? তবে অবাক হয়েছি, আমার সেই পিতামহটি চিরদিন যে কামনা প্রার্থনাটি করে এসেছিলেন, সেটি পূরণ হয়েছিলো। এবং হয়েছিলো মাত্র পক্ষকালের মধ্যে।

প্রার্থনাটি ছিলো, 'যেন শাঁখা সিঁদুর নিয়ে চিতেয় উঠতে পারি।'

তা এ প্রার্থনা হয়তো বাঙালি ঘরের মেয়েরা সবাই করে থাকে, পূরণ আর ক'জনের হয়? আমার পিতামহীর হয়েছিলো।

এসবও আমার পরে শোনা বড়দার সেজ না ন' কোন ছেলের কাছ থেকে। ওই একটা ছেলে আছে চৌধুরীবংশে, যার নিজস্ব কোনো রং নেই, বাদে বাপের মতোই 'সংসার বাড়ানো' ছাড়া। তার

শৌখিন পেশাটি হচ্ছে আত্মপরিজন জ্ঞাতিগোত্র, যে যেখানে তাদের খবর সংগ্রহ করা এবং একের সংবাদ অপরের কাছে পেঁছে দেওয়া। বলা যায়, স্বেচ্ছাসেবকের কাজ।

থাকে কোথায় ?

কোথায় নয়! জঙ্গীপুরে টিকিটা বাঁধা থাকলেও ছেলেটা- যেন নাম ছেলেটার ? ভুলে যাচ্ছি। ডাকা তো হয় 'বটাই বটাই' করে তা সেই নামেই সে সর্বজনপরিচিত। কারণ একমাত্র সেই সর্বজনের সঙ্গে পরিচয় বন্ধনে বন্দী। কাজেই তার থাকার কোনো স্থিরতা নেই। কখনো দেশের বাড়িতে, কখনো কলকাতায়, কখনো আত্মীয়- শ্বশুরবাড়ি, আত্মীয়জনের মামার বাড়ি, সম্পর্কিত যে কারো বাড়িতে গিয়ে পড়ে দু-চার দিন কাটিয়ে আসবেই। সে সব কোথায় ? কেন, কান্দী, ভগবানগোলা, লালগোলা বহরমপুর, গোয়াড়ি, কেষ্টনগর, রানাঘাট, কাঁচরাপাড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, আরো কতো জায়গায় বিয়েটিয়ের সূত্রে তো সব ছড়িয়ে পড়া। তাছাড়া—এমনিতেই তো সবাই একে একে দেশের বাড়ি ছেড়েছে।

আমাদের বাড়িতে এলেই জমিয়ে বসে বসেই বলবে, বুঝলে নাড়ুকাকা (আমার ওই অখাদ্য নামটা একমাত্র ওর কাছেই জীবিত আছে), তাহলে শুনুন। গেছলাম তো মেজকাকার সেজছেলের বাড়ি খাগড়ায়—

তবে জমে বেশী খুড়ির সঙ্গে।—অথবা 'জমায়'। বলে, দেশের বাড়িতে তো একবারও গেলে না খুড়ি! দেখতে কী বাড়ি! জরাজীর্ণ তবু এখনো মরা হয়নি।—তো সবাই তো একে একে সরে পড়ছে এই বটাই ব্যাটাই এখনো পুরনো বটবৃক্ষের বাসাটি আঁকড়ে পড়ে আছে।

কল্যাণী বলে, তুমি আর আছো কই বাবা ? সবসময়ই তো বাইরে বাইরে।

বটাই হেসে হেসে বলে, তাতে কী ? বলি টিকিটা তো বেঁধে রেখেছি সেখানে।

টিকি বেঁধে রেখে আর কী হলো ? নিজে তো পায়ে চাকা বেঁধে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বেড়াও! বৌটারই একা একা কষ্টের একশেষ

বটাই উদ্দীপ্ত হয়, 'একা' মানে? একপাল ছানাপোনা নেই? তাছাড়া কচি খুকী নাকি? প্রথম দিকে গোটা তিন-চার ছেলে বলে, তাই এখনো মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের শাশুড়ী হয়ে বসেনি!

তাতে কী? ছেলেপুলে, সংসার, এদের ঝামেলাটি নেয় কে?

বটাই আরো উদ্দীপ্ত হয় তখন, বুঝলে নাড়ুখুড়ি, তোমার বৌমাটি মেয়ে ভালো। ঝগড়া-টগড়া জানেই না। আমার ওপর কোনো দাবিদাওয়া রাখে না। সংসার নিয়েই মশগুল।

তা খরচটরচ চলে কিসে বাবা?

কিসে আবার? এখনো দু-পাঁচ বিঘে জমি-টমি আছে. তার ফসলটা পায়, আর আম-কাঁঠালের বাগান-টাগান যা জমা ধরিয়ে দেওয়া আছে তারও উপস্বত্ব আছে। বাগান পুকুরেও কিছুটা ধ্বংস অবশেষ আছে। আসলে গুষ্ঠীর সবাই এখানে ওখানে ছিটকে সরে গেছে, গাছপালা ডোবা পুকুর বাঁশঝাড় ইঁট কাঠ এ-সব তো আর সঙ্গে নিয়ে যায়নি? হা হা হা! আমার জীবদ্দশা ওতেই চলে যাবে।

কল্যাণী রাগ দেখিয়ে বলে, বৌমাটি সেকালের মেয়ে বলেই তাই, সয়ে যাচ্ছে। একালের মেয়ে হলে তোমায় ডিভোর্স দিয়ে দিতো বাবা।

বটাই সামনের সারির গোটা তিনেক দাঁত-পড়া 'সিন্ধুঘোটকে'র মতো মুখে হা হা করে হেসে বলে, ওইটিই তো পরম বাঁচন। বুঝলে নাড়ুখুড়ি, এদিকে খান্ডারনী হলেও পতিব্রতা নারী। যখন বাড়ি ফিরি, তখন অ্যায়সা যত্ন লাগায়, যেন গুরুপুত্তুর এসেছে না কুটুম এসেছে।—নিজে ছেলেপুলে নিয়ে সারাবছর যেভাবেই থাকুক, তখন ওই কী খাওয়া-দাওয়ার ঘটা! আবার ভাব দেখায় যেন সারাবছরই ওরা ওইভাবেই কাটায়। তো বুঝেও না বোঝার ভান করি। ছেলে-মেয়েও মায়ের বশে। মার বিপরীত বলবে না।—তা বারো মাস লেগে পড়ে থাকলে এই আয়েসটি হতো?—আবার দেখো যখন যেখানে যাই, দু-একদিনের মামলা তো? সবাই কুটুমের আদরই করে। তুমি! কদিন ধরে জামাই আদরে রাখেনি?—তবে? এই বেকার জীবন নিয়ে ভিটেয় পড়ে থাকলে—তোমার কথাই সত্যি হতো কি না কে জানে! হয়তো বৌ তালাক দিয়ে বসতো। এ বাবা বড় খাসা আছি।

হঠাৎ চোখের সামনে এক সেকেণ্ডের জন্যে একঝলক বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো। পরক্ষণেই নিঃসীম অন্ধকার। আর সেই 'নিঃসীম'কে চিরে ফালাফালা করে দিয়ে সেই 'সরকার ঠাকুমা' সদৃশ্য খ্যানখ্যানে গলাটা উচ্চারণ করে উঠলো, দ্যাখো কাণ্ড। দাদু এখেনে—এই অন্ধোকারের বারান্দায় চেয়ারে বসে বসে ঘুমাচ্ছে! আর আমরা—

তাকিয়ে দেখলাম চারদিক। কিছুই দেখা গেল না। লোডশেডিংয়ের দাপটে বিশ্বচরাচর অন্ধকারে ডুবে পড়ে আছে। তাই এতোক্ষণ টিভি-র আওয়াজ কানে আসেনি।

ঘুমাচ্ছে শুনে রাগে মাথা জ্বলে গেলেও প্রতিবাদ করতে যাওয়ার মানে হয় না। ঘুমোচ্ছিলাম না হয়তো, কিন্তু এখানেই ছিলাম কী? আমার মেজছেলের এই 'সীমান্ত' নামের অঞ্চলটির এক প্রান্তে ছবির মতো এই ফ্ল্যাটখানার পশ্চিমের বারান্দাটায়?

মনে পড়লো তখনকার সেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির পরই হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেছলো। আর আমি বাতাসের আশায় ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে বসেছিলাম। তা বসবার মতো জায়গায় 'বসবার' উপযুক্ত আসন রাখা আছে।

সেই তখন থেকেই লোডশেডিং চলছে! আর আমি? আমি এই অন্ধকারের মধ্যে পাড়ি দিয়ে চলেছি একখানা দুস্তর সমুদ্র।···

পিসির সেই থমথমে মুখটাকে দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পেলাম প্রায় অস্ফুট একটা 'দুর্গা দুর্গা' স্বর।

আমার মেজছেলের এই প্রায় শহরতলী ছড়ানো বাসাটায় কী আছে রে বাবা! বাতাসে কেন এমন হারিয়ে যাওয়া চেনা চেনা গন্ধ? এই রাতেও কোথাও যেন কী একটা অনামী বুনো বুনো ফুল ফুটেছে। অথচ গন্ধটা ভারি চেনা চেনা।—কোনোখানের রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়ার সময় বৈশাখী সন্ধ্যের এলোমেলো বাতাসে এই গন্ধটা লুটোপুটি খেতো।

হয়তো কল্যাণীও যদি আসতো, তাহলে পরিস্থিতিটা এমন হতো না। কল্যাণীর উপস্থিতিতে তো আর 'হারিয়ে যাবার' উপায় থাকে না।—তার হলো গিয়ে জমজমাটি কারবার।

নিঃসঙ্গতাই হারানো সঙ্গগুলোর আশেপাশে ঘুরে মরে।—

টর্চটা আবার জ্বলে উঠলো। এবার আর তক্ষুণি নিভে গেল না।—মেয়েটা বলে উঠলো, টেবিল লাগানো হয়েছে দাদু!

এই একটি ভাষা ওর মুখস্থ। 'খেতে দেওয়া হয়েছে' অথবা 'খাবেন আসুন', বলে না। বলে 'টেবিল লাগানো হয়েছে'। কোথায় শিখেছে কথাটা!

উঠে পড়েছিলাম। বললাম, খাবার সময় হয়ে গেছে না কী?

ও বললো, তা আবার হয় নাই? বরং 'কারেণ্ট' আসার পিত্যেশে এতোক্ষণ দেরী। ও আজ আর আসবে না। চলেন, মোমের আলোতেই খেতে হবে।

টর্চটা ধরলো আমার যাত্রাপথে।

'মোমের আলোয়' বোঝা যাচ্ছে না আমার ছেলে-বৌয়ের মুখ কতোটা থমথমে। তবে বাবলি নিজস্ব ধীরতায় বললো, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

বলতে তো আর পারি না 'ঘুমিয়ে পড়িনি বাপু, শুধু অনেক দূরের রাস্তায় গিয়ে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম'। তাই একটু হেসে মেনে নিতে হয় অপবাদটা। বলতে হয়, আর বলো না বাবা। বুড়ো বয়সের ব্যাপার! দিব্যি উড়ো উড়ো হাওয়ার মধ্যে বসে থাকতে থাকতে—

লোডশেডিংটা আজ যেন বেশ উপকারই করেছে। হঠাৎ এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যাওয়া অবস্থাটাকে দৃষ্টিগোচরে আনলো না।

খাবার গুছিয়ে দিয়ে বাবলি আমার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, কালই তুমি যদি ইনভার্টারের ব্যবস্থা না করো, তো আমি নিজেই হাতে নেবো! আশ্চর্য! উপায় থাকতেও এইভাবে নিরুপায়ের 'রোলে' পড়ে থাকা!

এসেই প্রথম দিন থেকে 'টেলিফোন টেলিফোন' শুনতে পাচ্ছিলাম। —যুক্তি অবশ্যই রয়েছে। এরকম শহরছাড়া হয়ে দেহাতে পড়ে থাকতে হলে টেলিফোনটা অবশ্যই 'কম্পালসারি'। আর এখন দেখাই যাচ্ছে-এই কম্পালসারির তালিকায় প্রথম সারিতেই 'ইনভার্টার জেনারেটার'—ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হয়। টেলিফোন অবশ্য এতো সহজে মেলে

না। তবে 'সহজ' করে নেবার কলকাঠিও আছে বৈকি। এ দুটো হয়ে গেলে অবশ্যই আমার মেজছেলেটার রাতের ঘুম বিনষ্ট হতে থাকবে গাড়ির বায়নায়।

না হবে কেন? আধুনিক জীবনে যেগুলো অপরিহার্য সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে না ক্রমশ।—

সবকিছু হয়ে গেলে তবে নাকি এরা ঘরে দোলনা টাঙিয়ে দোলনায় দোল খাবার জন্যে 'শিশুর' আমদানী করবে!

কথাটা আমায় বলে ফেলেছিলো আমার বড়ছেলের বৌ তিস্তা। —হয়তো তাদের জীবনে অনেক অগোছালোর মধ্যে হঠাৎ এই শিশুটা এসে যাওয়ায় ছোটজায়ের কাছে লজ্জিত ছিলো বলেই একটু শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলে ফেলেছিলো কথাটা।

আমি অবশ্য শুনেই ছিলাম, কোনো মন্তব্যের দিকে যাইনি। পাগল না হলে 'শ্বশুর' হয়ে তেমন করেও না কেউ।…তিস্তা আর কোনো শ্রোতা হাতের কাছে না পাওয়ায় এমন অপাত্রে সংবাদটা পরিবেশন করে বসেছিলো।

তবে মনে মনে তো কথার চাষ চলেই চলে। সে তো বলে ওঠে, 'সবকিছু' আয়ত্তে এসে গেলে?…ওই 'সব'-এর কী কোথাও সীমারেখা টানা আছে? আর লোকে-রেখাটা মেনে চলে?

ভেবে রেখেছিলাম, এইবার ফিরে যাবার কথা পাড়বো। আজ আর সাহস হলো না। মিস্টার হাজরার কাছে বোকা বনে যাবার দলিলপত্রগুলো এখনো হাতের মধ্যে। ইচ্ছে করলেই আমি সেটা আসান করতে পারি। কাজেই কোনো রকম কথার মধ্যে না যাওয়াই ভালো। অতএব কষে গাল পাড়া যায় শহরের বিদ্যুৎ দপ্তরকে।

ভাইয়ে ভাইয়ে যখন মনান্তর মতান্তর ঘটে তখন একমত হবার একই সুরে কথা বলার সেরা উপায়ই হচ্ছে পড়শীকে গাল পাড়া। পড়শীর সমালোচনা করা!

দিন দুই-তিন গেছে। ইতিমধ্যে শুধু একদিন প্রবুদ্ধ একটু ক্ষোভের হাসি হেসে দেয়ালকে শুনিয়ে বলেছে, 'কাগজগুলো, সাদা

ফেরত দেওয়ায় মিস্টার হাজরা তো তাজ্জব বনে গেলেন।'

এর বেশী নয়।

অতএব ভাবছি আজ সন্ধ্যেবেলা কথাটা পাড়ি। সত্যি বলতে, কল্যাণীর জন্যে খুব মন কেমন করছে। সেই যে ডাকাবুকো মেয়েটা নিজেই 'প্রস্তাব' দিয়ে বিয়েটা ঘটিয়ে ছেড়েছিলো, তদবধি এই দীর্ঘ-কাল ওকে ছেড়ে কোথাও থাকিনি।—তরুণজনেরা অবশ্যই শুনতে পেলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। একটা সত্তর-বাহাত্তর বছরের বুড়োর ক'টা দিন গিন্নীকে ছেড়ে থাকতে বিরহ জেগে উঠেছে? অ্যাঁ?

'প্রেম ভালবাসা বিরহ বেদনা মিলনানন্দ' ইত্যাদি সুন্দর সুকুমার বস্তুগুলো হচ্ছে একমাত্র যৌবনের একচেটিয়া। হাড়বুড়োজনেরা যদি এসব শব্দগুলোর অধিকার নিয়ে দাবি করতে বসে, তার থেকে হাস্যকর আর কী আছে?

তা বুড়োদের তরফ থেকে তো তাল ঠুকে যৌবনের এই উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে নামা যায় না। প্রেস্টিজে বাধে। অতএব 'ভান'-এর উপর চালিয়ে যেতে হয়। ভানটি হচ্ছে-'পাগল?' এই বয়সে আবার ওসব কী?—আমার যে এখন ইচ্ছে করছে কল্যাণীকে একটা চিঠি লিখি, লজ্জার মাথা খেয়ে পারবো তা? নাঃ। পারা যাবে না। তাই মনে মনে চিঠি লিখে চলেছি, কল্যাণী, তুমি আমার অভ্যাসটা বড় খারাপ করে দিয়েছ। তোমার না দেখতে পেলেই নিজেকে কেমন বেওয়ারিশ আর অসহায় অসহায় লাগে।—এই যে এখানে হঠাৎ হঠাৎ নিমফুল আর কাঠচাঁপা ফুলের গন্ধে কোথায় যেন হারিয়ে যাই, ভুলে যাওয়া পথটায় আবার হাঁটতে থাকি, এসব হতো তুমি কাছে থাকলে?—তা এতে হয়তো এই পরিবেশে আর এই শূন্য পরিস্থিতিতে একটা মাদকতার স্বাদ পাই, কিন্তু তাতে দরকার কী বলো? বালি খুঁড়ে দুঃখ বার করা বৈ তো নয়। পিসির জন্যে এতো মন কেমন করেছে আর কখনো?—

চিঠি লিখলেও অবশ্য এসব কথা লিখতে পারতাম না। কিন্তু চিঠি লেখাটাই তো দুরূহ।—লোক হাসানো ছাড়া আর কিছু হবে না। আচ্ছা কল্যাণী, তোমারও কী এমন ইচ্ছে হচ্ছে না? অবশ্যই তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলে উঠবে, 'মাথা খারাপ! বয়েসটা

কোথায় গিয়ে পেঁছিছে সে খেয়াল আছে ?'—ওই 'ভান'। প্রেস্টিজ বজায় রাখতে ভানটি চালিয়ে যাওয়া।

'বয়েস হয়ে' গেলেও 'খিদে তেষ্টা ঘুম-পাওয়া' সব থাকবে, থাকবে রাগ দুঃখু অভিমান জেদ, অহংকার হিংসে, শুধু থাকতে পারে না 'প্রেম ভালোবাসা বিরহ বেদনা'। ওটা ফুরিয়ে যাবে।

কেন ? কেন ? সত্যিকার ভালোবাসা কেবলমাত্র বয়েস হয়ে গেছে বলে সত্যিই ফুরিয়ে যায় ?

এই যে নীলোৎপল ডাক্তার। যার বদান্যতায় এই নরনারায়ণ চৌধুরী আর কল্যাণী চৌধুরী সাত ঘাটের জল খেতে খেতে অবশেষে এই কলকাতায় এসে জীবনটাকে স্থিতু করে সুখে সংসার পেতে বসতে পেয়েছিলো, সে লোকটারও তো বয়েস কম হয়নি। এই নরনারায়ণেরই তো কাছাকাছি বয়েস। তবু এখনো সে তার বর্তমানের অতি দামী জায়গার অতি দামী বাড়িটার অর্ধাংশ যে ছেড়ে দিয়ে রেখেছে নামমাত্র ভাড়ায়, সেটি কিসের প্রেরণায় ?

এখনো কী তার মনের মধ্যে 'কল্যাণী' নামের একটি মাদকতা কাজ করে চলছে না ?

সেই একদা যখন ডাক্তার নিজেই তার 'বাড়ির অর্ধাংশ ভাড়া দিতে চায়' বলে আমাদের অফার করেছিলো তখন ওই 'রিচি রোড', আজকের মতো এত মহার্ঘ হয়ে না উঠলেও অভিজাত ছিলো বৈকি। তবু কী অকিঞ্চিৎকর ভাড়ায় প্রায় জোর করে আমায় এসে প্রতিষ্ঠিত করলো লোকটা! তো সে কী 'আমার' জন্যে ?

অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনোদিনের জন্যে সে তার সীমা-রেখা লঙ্ঘন করেনি, তবু অন্তঃসলিলা নদীর মতো, তার জীবনের জীবনীরসটি যে একটি মুগ্ধ ভালোবাসা, সেটি আমার থেকে আর বেশী কে জানে ?—

স্নেহ, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা, আর একটি অনির্বচনীয় মুগ্ধতায় গড়া এই এক অমূল্য বস্তু বহন করে আসছে লোকটা কতোটি কাল।

আচ্ছা লোকটা কী বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হয়নি ? ও—বিয়ে-থাওয়া করেনি তা নয়। মা-বাপের ইচ্ছার প্রেরণায় কারছিলো বা

করতে বাধ্য হয়েছিলো! কিন্তু কপালে সংসার করা ছিল না। তাই অকালে বিপত্নীকের তালিকায় নাম উঠে গেল লোকটার!

হয়তো 'অমনটা' না হলে 'এমনটি' হতো না। হয়তো সেই বৌ 'গিন্নী' হয়ে উঠে অহেতুক অপচয়ের পথ কবেই বন্ধ করতে এই নরনারায়ণকে গৃহচ্যুত করে ছাড়তো। অথবা নরনারায়ণই 'মানেমানে' পথ দেখতো।—কিন্তু সেসব হয়নি। পরিস্থিতি একই রয়ে গেছে।

আমি যখনি বিবেকের দংশনে ভাড়াবাড়ানোর কথা বলতে গেছি, লোকটা তখনি ভয়ানক সঙ্কুচিত হয়ে বলেছে, 'দরকার হলে আমি নিজেই বলবো জামাইবাবু। আমার আর কতটুকু দরকার?

হ্যাঁ, এই 'জামাইবাবু' ডাকটাই রপ্ত করেছিলো লোকটা সেই দেশের বাড়ি থেকে। বাপ ডাক্তার নীলাম্বর গাঙ্গুলী, পুলিশের ঠ্যাঙানি খাওয়া হতচেতন কল্যাণী নামের মেয়েটাকে 'মেয়ে' বলেছিলেন বলেই বোধহয়।—অবশ্য 'মেয়ে' ডাকটার বদলে 'বৌমা' ডাকতেও চেয়েছিলেন তিনি, তবে পরিস্থিতি তো অন্য ছিলো। কাজেই তাঁদের সে আশায় ছাই পড়েছিলো।

এই দ্যাখো, আবার সেই ফেলে আসা রাস্তায় ঘুরে মরছি।

আচ্ছা কোন পরিস্থিতিতে আমরা নীলোৎপল ডাক্তারের বাড়িতে এসে উঠেছিলাম?—

হ্যাঁ, আমার তখন মা মারা গেছেন। বড়মামা জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর 'সবরমতী আশ্রমে' চলে গেছেন, এবং ছোটমামা 'সন্নিসী হবো না সংসারী হবো' ভাবতে ভাবতে একটা দজ্জাল মেয়েকে বিয়ে করে বসে কেঁচোত্ব প্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। এবং ওরই ফাঁকে আমার বড়-ছেলেটা তখন সবে দাঁড়াতে শিখেছে।

আর বেকার নরনারায়ণ চৌধুরী তখন হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবস্থা এমত প্রকার। আর আমার সেই বোনটা? সরলতার প্রতিমূর্তি মিনু? সে তো সেই যখন বিয়ের তোড়জোড় চলছে তার, তখনই হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গেছলো। তার প্রাণের দাদার সঙ্গে তার প্রাণের 'কল্যাণী'দির বিয়ে হলো, এইটুকুই যা দেখে যেতে পেরেছিলো। তারপর থেকেই মার স্বাস্থ্যটা ভেঙে গিয়েছিলো।

-মিনু যেন আমাদের সংসারে একটি পবিত্র বিষাদের সম্বল।

তো নীলোৎপল ডাক্তারেরও তো ইত্যবসরে বাপটি গেছে, এবং বিয়ের বছর দুইয়ের মধ্যেই পত্নীবিয়োগ ঘটেছে। তখনই চিকিৎসক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে কলকাতায় এসে চেম্বার খুলে বসেছিলো নীলোৎপল এবং মাকে নিয়ে আসবার জন্যে বহু সাধ্যসাধনা করেছিলো। কিন্তু মা অনড় অচল। 'ভিটেবাড়ি', ঠাকুরদেবতা এবং স্বামীর স্মৃতিমণ্ডিত ঠাঁই ছেড়ে এক পাও নড়তে রাজী হননি। দু-চার দিনের জন্যেও না। গিয়ে যদি হঠাৎ ভিটেছাড়া হয়ে মরতে হয়! না বাবা! সে রিস্‌কে কাজ নেই!

'এ হেন কালে নীলোৎপল একবার দেশের বাড়িতে এসে আমায় নির্বেদ সহকারে পরামর্শ দিয়েছিলো, এসব অঞ্চলে কিছু হবে না জামাইবাবু, আপনি কলকাতায় চলে আসুন। একটা কিছু যোগাড় হয়ে যাবে।'

কিন্তু 'কলকাতায় চলে আসবো মানে'? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে উঠবো কোথায়? খাবো কী?

দূর! ওটা আবার একটা সমস্যা নাকি? এই যে চেম্বারের জন্যে ডাক্তার কলকাতা শহরে রাস্তার ওপর একখানা মানুষের মতো বাড়ি ভাড়া করে সাজিয়ে বসেছে, তার পুরো দোতলাটা হাঁ হাঁ করছে না? বড়সড় চার চার খানা ঘর, রাস্তার ধারে টানা বারান্দা, একা এতো নিয়ে হাঁপিয়ে মরছে নীলোৎপল। ভেবেছিলো মাকে ধরে করে নিয়ে যাবে, তা হলো কই?—তো যতদিন না চাকরি আর বাড়ি যোগাড় হচ্ছে জামাইবাবু, না হয় দয়া করে ওখানেই উঠুন, থাকুন! তারপর যা ব্যবস্থা হয়!

নীলোৎপলের মা-ও বলেছিলেন তাই যা না মা কল্যাণী। তবু তুই স্বামী-পুত্তুর নিয়ে গিয়ে উঠলে বাড়িটায় একটা সংসারের চেহারা হবে। হতভাগাটা তবু দুদিন বাঁচবে।

মহিলাটি কী তাঁর পুত্রের মুগ্ধ দৃষ্টিটুকু কোনোদিন দেখতে পাননি? নাকি পুত্রের ওপর এবং তাঁর এই পাতানো কন্যাটির ওপর অগাধ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ছিলো বলেই এমন সাহস করেছিলেন? সাধারণত ঝুনো সংসারী লোকেরা তো এমন সাহস করে না। অতএব চলেই এসেছিলাম।

সত্যি বলতে, চাকরি একটা ভালই জুটে গেছলে বেসরকারি সওদাগরি অফিসে।—দেশে স্বাধীনতা এসো বণিকরা অনেকেই বিদায় নিয়েছে এবং নিয়ে চলেছে। ভাগ্যে দেশী বণিকের অফিসে পেয়ে গেছলাম একটা 'চাকরগিরি'।

কিন্তু বাড়ি? ভাড়া তখনো আকাশ ছোঁওয়া হয়ে না উঠলেও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।—বানের জলের মতো লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কলকাতায়, কোনো দরজার মাথায় 'টু-লেট' লটকানো দৃশ্য আর দেখা যায় না।—তবু সন্ধান নিয়ে নিয়ে আমার রেস্ত অনুযায়ী যেখানেই 'বাসা' দেখতে যাই, নীলোৎপল 'হ্যাক থু' করে নাকচ করে দেয়। বলে, ওইখানে গিয়ে থাকতে পারবেন আপনি?—ছি ছি, এই বাড়ি দেখে গেছেন আপনি? কমন বাথরুম! থাকা সম্ভব হবে?

ঠক বাছতে গাঁ ওজোড়।

শেষে বলে বসলো, 'ঠিক আছে, আমার এখানেরই সাবলেট করে টেনান্ট হন। আমাকেই মাসে মাসে ভাড়া গুনে দিন। আমারও একটা বাড়তি আয় হোক, আর আপনারও 'অধিকার বলে' থাকার শান্তিটা লাভ হোক।'

সেটাই কায়েম হলো। না হলে উপায়টা কী? সত্যি যেরকম সব দু-একখানা ঘরের বাসা দেখে আসা হয়েছে, সেখানে থাকতে যাবো ভাবতেই ইচ্ছে হয়নি।

নীলোৎপলের বাড়িতেও দুখানা ঘরের ভাড়াটে হওয়া গেল, কিন্তু সে তো নামকা ওয়াস্তে। সারা বাড়িটাই তো কল্যাণীরই দখলে। ডাক্তারের তো একটাই ঘর লাগে। তার সঙ্গে অবশ্য অ্যাটাচড্ বাথরুম আছে।—রান্নাঘর? সেটাই বা তার দরকার কী? তার চাকর কাম দারোয়ান বিশু তো নীচের তলায় নিজের জন্যে যেখানে রসুই করে সেখানেই তো ডাক্তার সাহেবেরও রসুই পাকায় বরাবর।—তিনতলার ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে একটা 'এল শেপ' সিঁড়ির ঘর, সেটাই বাড়ির রান্নাঘর! সেটাই কল্যাণীর রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর বলে ধার্য করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কোনোদিন এমন কথা বলেনি ডাক্তার 'একসঙ্গে রান্না হোক না।'—না তেমন নির্বোধ নয় লোকটা। সীমানার বাইরে পা ফেলতে

। তবে কল্যাণী যদি কোনোদিন ভালো কিছু রান্না করে, ওকে এবং বিশুকে দিয়ে আসে, দুজনেই বিগলিত হয়ে খায় এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।—কিন্তু কল্যাণীও চৌকাঠের মধ্যে পা রেখেই দাঁড়িয়ে থাকে। ওরকম ঘটনা ঘনঘন ঘটিয়ে বেশী মাখামাখির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে না।

কিন্তু এসব কী আজকের কথা? হিসেব করলে তো বহুকালের। —অথচ মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা।—অথচ এখানে থাকতে থাকতেই আরো দুটি পুত্ররত্ন লাভ হয়েছিলো আমাদের, কল্যাণী বলেছিলো, নামে আর নারায়ণ নয় বাপু! অন্য ধারায় চলে এসো। তাই বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ, তথাগত।

ওখানেই ওরা হাফপ্যাণ্ট পরে ম্যাডাক্স পার্কে বল খেলা করেছে। আবার ওখান থেকেই ফুল প্যাণ্ট পরে প্রেম করেছে, বিয়ে করেছে, অফিস গেছে।—আমার বড়ছেলেটি অবশ্য ওখান থেকে 'অফিস' যায়নি। কারণ সে সাত তাড়াতাড়ি প্রেমে পড়ে, সেই প্রেমিকার কেষ্টবিষ্টু বাবার দৌলতে দাক্ষিণ্যে একখানা জম্পেশ চাকরি বাগিয়ে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই বৌ নিয়ে দক্ষিণ ভারতে পাড়ি দিয়েছে। ছুটিছাটায় এলে শ্বশুরবাড়িতেই ওঠে। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে এক আধবেলা থেকে যায়।—নিমন্ত্রিত কুটুমের মতোই। তবু মা ভাইদের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট করেনি। ভারী সপ্রতিভ, আর ভারী অমায়িক ওরা, ছেলে-বৌ দুজনেই।

তো এখন তো তারা বছর সাতেকের ছেলেটাকে 'দুন' স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দিয়ে শ্রীলঙ্কায় বাস করতে গেছে।

আমার মেজছেলে অবশ্য যতদিন না শহরতলীর এই ফ্ল্যাটটি কিনেছে, রিচি রোডের বাসাতেই থেকেছে। তবে ভারী সুন্দর আলগা আলগাভাবে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মেয়েরা যেমন শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে বাপের বাড়িতে দু-দশ দিন কাটাতে এসে আলগাভাবে থাকে, আমার মেজছেলেটিই বিয়ের পর সেই ধরনের ভূমিকায় থেকেছে।—তখন যা করে বাবলির চোখের ইশারায়, যা বলে বাবলির

মুখের রেখার দিকে তাকিয়ে এবং এ সংসারটায় যে তারা শেকড় পুঁতবে না এমন একটি অলিখিত ঘোষণা করে রেখেই থেকেছে।

স্বল্পভাষী নীলোৎপল ডাক্তারের সঙ্গে আমার ছেলেদের ছোটবেলাতেও 'মামু মামু' করে তেমন মাখামাখি ছিলো না, বড় হয়ে তো আরোই দূরত্ব রচনা করেছে।

ওদের কি আর চোখ ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ এড়ায়নি ডাক্তারের মধ্যেকার ওই মধুর দুর্বলতাটুকু?—কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশটি এতোই অদৃশ্য যে তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা চলে না। বিদ্বেষও নয়। বড়জোর দূরত্ব রাখা।—বাড়িওলার সঙ্গে ভাড়াটের যেমন থাকা উচিত।

তবে কিনা লোকটা ডাক্তার। কাজেই, সময় অসময়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়।—তো এইসব ঘটনাসমূহ কী মসৃণভাবেই এগিয়ে গেছে এবং এতোগুলো মানুষকে জীবনের পরিণতির পথে নিয়ে চলেছে ভাবলে 'হাঁ' হয়ে যেতে হয়। এতোসব হয়ে চলেছে, ওই পরিচিত একটু গণ্ডীর মধ্যে থেকেই? নরনারায়ণ চৌধুরীর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপের ওপর আগাগোড়া চুনকাম হয়ে গেছে, কল্যাণী চৌধুরীর কেশ-কলাপের ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী রেখার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে এবং ডাক্তারের মাথাটা প্রায় বিদ্যেসাগরের কাছাকাছি হয়ে গেছে।—এসব বিপ্লব ঘটে গেছে কী নিঃশব্দে!—সবই চোখের সামনে দিয়ে, অথচ যেন চোখের আড়ালে। তাই মনেই হয় না 'কতো দিন'।

আসলে হয়তো—বারবার জায়গাবদল, বাড়িবদল, পরিবেশবদল ইত্যাদি ঘটলে মানুষের বয়েস বেড়ে যায়। একই জায়গায় একই গণ্ডীতে থেকে গেলে, পায়ের তলার মাটি, মাথার ওপরকার ছাত আর চারপাশের দেওয়াল একই থেকে গেলে, মনের মধ্যে যেন একটা রক্ষণশীলতা বজায় থাকে।—তাই মনে হয়, সেই—'আমিই' তো রয়ে গেছে, রয়ে গেছে সেই কল্যাণীও।

তা নীলোৎপল ডাক্তারও তো তাই রয়ে গেছে। 'বয়েস হয়ে গেছে' বলে কী তার ভালোবাসাটাসা শুকিয়ে ঝরে গেছে?—মোটেই তা নয়। এখনো তার মধ্যেকার সেই অনির্বচনীয় মুগ্ধতাটুকু অম্লান!

কখনো কোনো সময় কল্যাণী হেসে হেসে বলে, 'ডাক্তারবাবুর মাথাটি যে প্রায় পাকা বেলের তুল্য হয়ে আসছে।'

ডাক্তার পরম প্রসন্নতায় একবার পালিশ-মসৃণ পাকা বেলের ওপর হাত বুলিয়ে বলে, 'চুলো ডাক্তারের থেকে টেকো ডাক্তারের মান্য বেশী।'

আবার ডাক্তারই হয়তো কখনো বলে, 'কল্যাণী, তুমি কিন্তু হঠাৎ বেশ রোগা হয়ে গেছো। একটা টনিক গোছের কিছু খাওয়ার দরকার।'

কল্যাণী বলে, 'আপনার চশমার পাওয়ার বদলান ডাক্তারবাবু। 'দৃষ্টিক্ষীণ' হয়ে পড়েছে। আরশির সামনে দাঁড়ালে তো দেখতে পাই 'ডবল চিন্' আর দুগালে একজোড়া ডাবর।'

এই পর্যন্তই। মাঝে মধ্যে এমনি সব ছোটোখাটো কথার আদান-প্রদান। একই বাড়িতে বসবাস বলে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা চলেছে কোনোদিন, এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।—ও আমায় বলে জামাইবাবু আমরা ওকে বলি ডাক্তারবাবু। ব্যস। তবে অবশ্য কল্যাণীকে কল্যাণীই বলে ও। তার মধ্যে একটি সহজ স্নিগ্ধতার সুরের স্পর্শ থাকে।

আমি ওদের দুজনার ভেতরের এই মাধুর্যটুকুকে সম্ভ্রম করি, শ্রদ্ধা করি।

আমাদের ছেলেরা কী করে জানি না।—তবে একটা মজা, এ বাড়িতে যে দুটি 'পুরাতন ভৃত্য' আছে, একটি নীলোৎপলের বিশ্বনাথ মিশ্র বা বিশু এবং আমারও নয় নয় করে অনেক দিনের, 'নিমাইচাঁদ'। এরা দুজনে যেন হরিহর একাত্মা।—'বাঙালি-বিহারী' সমস্যা তাদের কুটিল করে তোলেনি কোনোদিন। কাজ সাঙ্গ হলে দুজনে একত্রে বসে দেশের হালচাল, সেকাল একালের তুলনামূলক সমালোচনা এবং বর্তমান বাজারদর নিয়ে জম্পেশ আলোচনা চালিয়ে যায়।

ক্রমশ আর অবশ্য 'পুরাতন ভৃত্য' শব্দটাও অভিধানে থাকবে না। থাকবেই বা কেন? 'ভৃত্য' শব্দটাই তো অপাংক্তেয়। এখন তো সবাই 'কাজের লোক।'

কথা আছে—'গোলাপে যে নামে ডাকো সৌরভ বিতরে।' কিন্তু মানুষের বেলার বোধহয় এ নিয়ম খাটে না। 'নাম' বদলের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আচার-আচরণ-চরিত্র সব পাল্টে যায়। এখনকার কাজের

লোকেরা তাই আর 'পুরাতন' হবার বোকামিটা করতে চায় না। দু-মাস ছ-মাস অন্তর মনিব বদলানোটাই তারা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। তাতে প্রেস্টিজ থাকে। এবং বৈচিত্র্য থাকে।

মনিববাড়ির সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন ?—

হ্যাৎ। মানুষ আর এখন অতো বোকা নেই। চিরকাল ওই সেণ্টিমেণ্ট দেখিয়ে মনিবরা তোমাদের শোষণ করে এসেছে না ? আরো হতে দেবে তো ?—

আচ্ছা, আজকাল আমার মধ্যে এতো কথার চাষ কেন ? এটাই কী তাহলে বার্ধক্যের লক্ষণ ? কই আগে তো এতো সব—আবোল-তাবোল চিন্তা মাথায় ঘুরতো না।—জীবনের তো নানা স্টেজ পার করে এলাম। কতো আকাশে ডানা মেললাম। মাটিতে কতো ধাপ, কতো রং।—তারপর কবে কোন একদিন ডানা গুটিয়ে খাঁচার মধ্যে বসে পড়েছি।—আমার কালের ওপর দিয়ে কতো ঝড় বয়ে গেল দেশে, দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ দেশভাগ, জলস্রোতের মতো উদ্বাস্তুর স্রোত, গদির লড়াই, পাতাল রেল, উড়াল পুল, কতো কী ! অথচ দৈনন্দিনের পাখায় ভর করে জীবনটা তো বেশ এগিয়েও গেল। এখন কর্মহীন হয়ে পড়েই কী জাবরকাটার অভ্যাসটা ভেতরে গেড়ে বসছে ?—

নাঃ। আর এই নিমফুল কাঠচাঁপা ফুলের গন্ধবাহী এই শহরতলীর পরিবেশে থাকা নয়। ছেলে-বৌ হাসে হাসুক, বলবো, এবার চলি !

যতটা থমথমে পরিবেশের আশংকা করেছিলাম ঠিক ততটা হয়নি। হয়নি, অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে বাবলির বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায়। —আমার বোকা ছেলেটা একটু থমথমে আছে এখনো, তবে বাবলির অনুকরণও তো করতে হবে তাকে !

তো দুপুরে খেতে বসে বাবলি বলে উঠলো, 'তিস্তাদির একটা চিঠি এসেছে।'

বড়জাকে শুধু 'দিদি' বলে না বাবলি, বলে তিস্তাদি'।

চিঠি এসেছে।

খুব সহজ পরিচিত একটা কথা। বললাম, ভালো আছে তো দুজনে?

বাবলি বলল, কী জানি!

কী জানি! লেখেনি কিছু?

না। শুধু লিখেছে, 'অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত দেখছি, এই জীবনের মধ্যে নিজেকে আর কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যাবে না। এর থেকে মুক্তির চেষ্টাই করতে হবে। তাই চলে যাচ্ছি।'

'এই জীবনের মধ্যে নিজেকে আর খাপ খাওয়াতে পারা যাবে না!'

এটা কোন ভাষা! এর নিহিতঅর্থটি কী? মাথাটা কেমন গুবলেট হয়ে গেল। প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়া 'শ্রীলঙ্কার' উত্তাল হিংস্র অবস্হার কথাটাই মনের মধ্যে পাক খেয়ে গেলো। আর বোবার মতো বলে ফেললাম, তা শ্রীলঙ্কার যা অবস্হা শুনেছি, চলে আসাই ভালো। বুদ্ধ কী রিজাইন দিয়েই চলে আসছে? না আপাতত ছুটি নিয়ে—

বাবলি আকাশ থেকে পড়লো।

দাদা? দাদার আসার প্রশ্ন উঠছে কেন? তিস্তাদি তো একাই আসছে।

মনের মধ্যে আবার একটা বোকামি খেলে গেল এখানকার মেয়েরা তো দেশ-বিদেশ যাওয়া-আসায় সঙ্গীর তোয়াক্কা করে না। নিশ্চয় ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পরেছে না, তাই স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার মতলবে—

ভাগ্যিস আবার বোকামিটা প্রকাশ করে ফেলিনি। শুধু উচ্চারণ করেছি, একাই আসছে!

প্রশ্ন নয়, এমনি উচ্চারণ।

বাবলি একটু যেন হাসলো। বললো, তা যা বুঝলাম, তাতে একা ছাড়া আর-ইয়ে জলপাইগুড়িতে তো ওর আর এখন কেউ নেই। মা তো ছিলেন না, বাবাও ও-বছর মারা গেছেন। দাদা-বৌদির সঙ্গে সেরকম ইয়ে নেই। মনে হচ্ছে এখানেই এসে উঠতে চায়। আর

এসেই স্যুটটা ফাইল করতে চায়।

বাবলির চোখে-মুখে এক ঝিলিক কৌতুকের হাসি।

আমি কি বাংলা ভাষা ভুলে গেছি? না আমার মেজছেলের বৌ যে ভাষায় কথা বলছে সেটা বাংলা ভাষা নয়?

স্যুটটা ফাইল! মানে?

হ্যাঁ, এটা আমি বলে ফেললাম।

বাবলি সহজভাবেই বললো, মানে আর কী বাবা?

বুঝতে পারছেন না? 'ডিভোর্স' চেয়ে কেস ঠুকবে! চিঠি পড়ে তাই মনে হচ্ছে।

আমি বোধ হয় চীৎকার করেই উঠলাম। উত্তেজনায় আমার হাত-পা ঠকঠক করে কেঁপে উঠলো। আমি বলে উঠলাম, ডিভোর্স চেয়ে কেস ঠুকবে! বড়বৌমা! কী সব যা তা বলছ মেজবৌমা? কী বুঝতে কী বুঝেছ?

আমার মেজছেলের বৌ আমার মতো উত্তেজিত হলো না, তবে রীতিমতো বিস্মিত হলো। বললো, যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছি বাবা! কিন্তু এতে আপনি এতো আপসেট হয়ে যাচ্ছেন কেন বলুন তো? এমন ঘটনা কী ঘটছে না আপনার জানা জগতে?

আমি থমকে গেলাম। তাই তো। এমন ঘটনা আমার জানা জগতে ঘটছে না, তা তো বলতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে আমারই 'জগতের' মধ্যে ঘটবে? জগতে ঘটছেই বলে আমার বুকের কলজেটা ছিঁড়তে বসবে আমার ছেলের বৌ? যার দশ বছর হলো সুখী বিবাহিত জীবন কেটেছে। না বলে থাকতে পারলাম না, ওদের না ভালোবাসার বিয়ে মেজবৌমা?

বলে ফেলেই অবশ্য মনে হলো, ভাষাটা হাস্যকর হলো।

তো হাস্যকর হলে তো লোকে হাসবেই। আনার মেজবৌমার কথার মতো হাসিটাও সুরেলা। সেই সুরেলা হাসিটি হেসে উঠলো সে দুপুরের নিস্তব্ধতা খানখান করে।—হাসির পর উত্তরটা দিল।

বললো, একসময় যা ছিলো, চিরকালই যে তা থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি থাকে না।

চুপ করে গেলাম।

এ যুগের কাছে হয়তো তাই! গ্যারান্টি থাকে না।

আস্তে আস্তে একসময় খেতেও লাগলাম। বাবলিও বসে আমার সঙ্গে। বাঁ হাতে চামচ করে করে মাছ-তরকারি পরিবেশন করে। কী যেন একটা দিতে এলো, আমি বললাম, আর না। আর খেতে পারবো না।

বাবলি নিজে কিছুটা নিয়ে সহৃদয় সান্ত্বনার গলায় বললো, পরিস্থিতি তো পাল্টায় বাবা! যদিও ওদের দেখলে এমন আশঙ্কা কখনো মনে আসতো না—

আমার হঠাৎ চোখ উপচে জল এসে গেল। আর তখন বুঝতে পারলাম, আমি কতোটা বুড়ো হয়ে গেছি। চোখের জলটাকে চোখের মধ্যে আটকে রাখার ক্ষমতা নেই আর।

আস্তে বললাম, দশ বছর বিয়ে হয়েছে ওদের মেজবৌমা। একটা ছেলে রয়েছে—

বাবলি বোধহয় আমার চোখের জল দেখে একটু অপ্রতিভ হলো। ও বোধহয় এতোটা ভাবেনি। ওর মধ্যে যেন একটা কৌতুক কৌতুক ভাব কাজ করছিলো। এখন খুব নরম গলায় বললো, ওটা কোনো বড় প্রবলেম নয় বাবা! কতোজন বিশ-পঁচিশ বছর পরেও অন্য ডিসিসান নিতে বাধ্য হয়। ছেলেমেয়ে তো থাকেই।—তবে ভারী খারাপ লাগছে, আপনাকে এ সময় বলে ফেলে। ভালো করে খাওয়াই হলো না!

ভালো করে খাওয়া!

মনে মনে হাসলাম। একটা মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তারপর ভালো করে খাওয়া না হওয়ার জন্যে আপসোস! তা একরকম মৃত্যুসংবাদই বৈকি।—একটা বিশ্বাসের মৃত্যু। একটা নিশ্চিন্ততার মৃত্যু।

বাবলি আস্তে আস্তেই খায়। সেইভাবেই খেতে খেতে বললো, আসলে একটু আগেই চিঠিটা পেলাম তো। ফোন নেই যে ওকে জানাবো। ফোনটা যে কতোটা প্রয়োজনীয়! তো কাউকে না বলেও ঠিক—আরো একটা ব্যাপার—

বাবলি একবার জলের গ্লাসটা মুখে তুলে নামিয়ে রেখে বললো, তিস্তাদি লিখছে প্লেনের টিকিট পেলেই চলে আসবে। তো কখন

যে পেয়ে যাবে ঠিক তো নেই। এখানে উঠলে—মানে একস্ত্রী ঘর তো আর নেই!

বুঝতে পারলাম।

আস্তে বললাম, ঠিক। এমনিই ভাবছিলাম ক'দিন তো থাকা হলো! এবার গেলেও হয়। প্রভু আসুক। বলে দেখি, কালই সকালে তাহলে—

তবে আমিও হঠাৎ মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব না করে পারছি না। আমার এক ছেলের বৌ তার স্বামীর নামে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চালাতে আমারই আর এক 'ছেলের' বাড়িটাকে সুবিধেজনক ক্ষেত্র বলে মনে করছে।—তার মানে বাড়িটাকে আমার আর এক ছেলের বলে ভাবে না। ভাবে ওই বাবলি নামের মেয়েটার। যে নাকি তার স্বজাতি। এবং তার সম্পর্কে সহানুভূতি-সম্পন্ন। অতএব সাহায্যের হাতও বাড়াবে।

বাড়ি ফিরে মানে 'নিজের বাড়িতে' ফিরে মনে হলো যেন ডাঙায় উঠে পড়া মাছ আবার জলে নেমে আসতে পেয়েছে। অথচ একে লোকে 'বাড়ি' বলে না, বলে 'বাসা'। ভাড়াটে বাড়িকে চিরদিনই সবাইকে 'বাসা' বলতেই শুনি। সে হিসেবে ছেলের বাড়িটা 'বাড়ি'। কিন্তু ছেলের জিনিসকে নিজের ভাবতে পারা যায় না কেন? লোকে যে 'ছেলে' বলে এতো প্রাণ বার করে, ছেলেকে ঘিরে তার শৈশব থেকে কতো স্বপ্নের জাল বোনে, ছেলেকে 'কৃতী' করে তোলবার জন্যে ধন প্রাণ মন জীবন সব উৎসর্গ করে, সেটা কেন? ছেলের বাড়িটা ভাইপো-ভাগ্নের বাড়ি বাড়ির থেকে এমন কী তফাৎ? 'জামাইবাড়ি' জিনিসটি কেমন জানবার উপায় নেই, তবে সমাজে সংসারে চিরদিন 'জামাইবাড়ি' বলতে একটা দূরত্ব, কুটুম কুটুম ভাবই দেখেছি।—এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে এ যুগে বোধহয় ধারণা পালটাবার দরকার হয়েছে। 'জামাইবাড়ি' বরং 'অকুটুমবাড়ি'। কারণ সেখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীটি নিজেরই 'আত্মজা'।

কিন্তু ছেলেও তো আত্মজই।

তা পুরুষ জাতটার যতো মেয়েরা বোধহয় অমন সর্বান্তকরণে আত্মবিক্রয় করে বসে না।

যাকগে ওসব কথা, আমার সেই আযৌবনের আশ্রয়। আমার স্ত্রীর প্রেমিকের বদান্যতার নিদর্শন রিচি রোডের এই বাড়িটায় ফিরে যেন বাঁচলাম। যেমন বাঁচা যায় নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে ফিরে, জমকালো কী শৌখিন সাজসজ্জার খোলস ছেড়ে ঘরে ফিরে আধময়লা আটপৌরে পোশাকটার মধ্যে নিজেকে ভরে ফেলে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে।

কল্যাণী প্রথমটায় বলে উঠলো, কী! হয়ে গেল ছেলের ছবির মতো বাড়িতে আরাম করে থাকা?—প্রভু মেজবৌমা কী ভাবলো বলো তো?

বললো, কারণ তাড়াতাড়ি চলে আসার কারণটা তো এসেই বলে উঠতে পারিনি।—আশ্চর্য, সেই 'কারণটা' তো রয়েইছে, যার জন্যে গতকাল আমার চোখ দিয়ে জলই পড়ে গিয়েছিলো। অথচ এখন মনটা এমন হালকা লাগলো।—কৌতুকের হাসি হেসে গলা নামিয়ে বললাম, বেশীদিন তোমায় বেওয়ারিশ রেখে যেতে সাহস হলো না। কী জানি যদি হঠাৎ আমে-দুধে মিশে গিয়ে বসো!

কল্যাণী একবার ভুরুটা কোঁচকালো। তারপর বললে, 'একাত্তরটা' পার হলো বুঝি?

তা তুমি যাই বলো, চিরদিনই সদাই হারাই হারাই ভাব নিয়ে কাল কাটাচ্ছ।

বটে না কী? ভালো, ভালো। জানলাম আমি জিনিসটা ভালো মতো দামী। এখনো এক পয়সাও দাম কমেনি।

হাসলাম। কমবে কী গো! সোনা-রুপোর কী পুরনো হলে দাম কমে যায়?'

হুঁ। কদিন আমার শাসনের বাইরে থেকে হঠাৎ দেখছি বেশ ছ্যাবলা হয়ে উঠেছ। তো যাক ওদের খবর কী?

সইয়ে সইয়ে বলার থিয়োরিতে প্রথমটায় ওদের মনোভঙ্গের খবরটা জানালাম। হেতুটা যে আমায় হতে হলো, তাও বললাম।

কল্যাণী বললো, সেদিন প্রভু আমাকেও যেন টেলিফোনে এইরকম কী একটা বলেছিলো। আমি তেমন কান করিনি। তা মনোভঙ্গ

হলে আর করা যাবে কী?

তোমার মনে হচ্ছে না তো আমি একটা বুদ্ধুমি করলাম? প্রভু বললো কিনা, 'টাকা জিনিসটা ফ্যালনা নয় বাবা? মাস মাস পাঁচশ মতো টাকা—'

কল্যাণী বললো, তোমার কী ধারণা আমিও তোমার ছেলের মতোই একথা ভাববো?

তা অবশ্য নয়। আচ্ছা তোমার ছোট পুত্রটির মনোভাব কেমন?

কী জানি! প্রভুর মতো ওকে চট্ করে বোঝা যায় না।

বোঝা যে কাকে কতটুকু যায়?

বলে আমি একটু দার্শনিক হাসি হেসে ধীরেসুস্থে আমার ছেলের বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কারণটি ব্যক্ত করলাম।

কল্যাণী শুনেই বলে উঠলো, 'ভ্যাট্।'—তারপর বললো, তোমার মেজছেলের বৌ কী বুঝতে কী বুঝেছে তার ঠিক নেই। এরকম একটা অবিশ্বাস্য কথা তুমি বিশ্বাস করলে?

হাসলাম। বললাম, তিনি তো বললেন, এ যুগে এটা কোনো ব্যাপারই নয়। হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। বিশ-পঁচিশ বছর দিব্যি ঘরকন্না করেও হঠাৎ এরকম ডিসিসান নিয়ে আসতে পারে।

কল্যাণী বললো, সে দিক থেকে ধরলে মানুষের ব্যাপারে অসম্ভব বলে সত্যিই কিছু নেই। বিশ বছরের পুরনো চাকরও হঠাৎ সামান্য টাকা গহনার লোভে মনিবের গলায় কোপ বসিয়ে নিয়ে ভাগে। তবু তার মধ্যেও একটা ব্যাপার কাজ করে, 'লোভ'। এখানে কী পাচ্ছ তুমি?

কোথায় কী পাচ্ছি তা তো জানি না।

কল্যাণী একটুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে একটু কৌতুকের হাসি হেসে বলে উঠলো, এটা তোমার অতি চালাক বৌমাটির একটু চালাকি নয় তো?

চালাকি!

মানে নিজেদের 'শুধু দুটি'র সংসারের মাঝখানে এক জরদগব বুড়ো শ্বশুরকে আর কতোদিন বসিয়ে রাখা যায়? এমন একটা চালাকি খেলা গেল, যাতে সাপও—মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না।

আবার হেসে উঠে বললো, সেই যে সেই গল্পটা জানো না? দেশ থেকে জ্ঞাতি কুটুম্ব এসেছে, নড়ার নাম নেই। মনে হচ্ছে রাতে থেকে যেতে, চায়। কর্তাও মুখে তাদের বলছেন, থাকো থাকো, আজ তোমাদের কিছুতেই ছাড়া হবে না। আর তার সঙ্গেই মুখ শুকনো করে জানানো হচ্ছে বাড়ির চাকরটার বোধহয় কলেরা হয়েছে। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে অতিথিরা হাওয়া। তাদের নাকি ভীষণ কাজ। তক্ষুণি না গেলেই নয়।

উঃ, কল্যাণী। তোমার স্টকে এতো গল্পও আছে! একই সঙ্গে তো বসবাস করছি দুজনে, তুমি কোন ফাঁকে এতোসব গল্পের স্টক বাড়িয়ে চলো?

কল্যাণী হেসে বসে ওঠে, 'গল্পরা' তো বাতাসে ভাসে। দেখার চোখ চাই। শোনার কান চাই।

কল্যাণীর একটা দাঁত একটু উঁচু। ওকেই নাকি 'গজদন্ত' বলে। জানি না, এটা সৌন্দর্যের হানিকর কিনা। আমার কিন্তু মনে হয় একটা দাঁতের ওই উচ্চতাটুকু না থাকলে বোধহয় কল্যাণীর হাসিটা এতো সুন্দর হতো না। সেই কোন কালের আজিমগঞ্জের সেই বাড়িতে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম, হাসিটা যেমন লেগেছিলো এখনো ঠিক তেমনিই লাগে।—তবে একটা ভাবনা ধরেছে, কল্যাণীও তো ছেষট্টিতে পেঁছতে চললো। চুল তো পেকেওছে কিছু কিছু, কিন্তু দাঁত পড়েনি। না বাবা! কল্পনা করতেও ইচ্ছে হয় না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কল্যাণী আমার বড়ছেলের জীবনের আকাশের অশনি সংকেতটাকে আমল দিলো না। বললো, এ কথা কী বাবলি স্পষ্ট করে বলেছে, বড়বৌমা লিখেছে—'মামলা ঠুকতে আসছে!'

না তা ঠিক বলেনি। বললো, 'পড়ে মনে হলো'।

কল্যাণী আবার হাসলো, ঠিক আছে ওই। ওই ব্যাপার। চাকরের হঠাৎ কলেরা হওয়া। উঃ। বাড়ির মানুষ বাড়ি ফিরলে বাঁচলাম।

কেন, প্রভুকে না বলেছিলে, থাকুক না কিছুদিন, খোলামেলা জায়গা, শরীর সেরে যাবে।

সেও ওই 'থাকো থাকো আজ আর তোমাদের ছাড়া হবে না'—হি হি! লোক দেখানো। আসলে আমরা নিজেরাই জানি না আমাদের

মধ্যে কতোটা নির্ভেজাল কতটা ভেজাল। চিরদিনই লোকে যাতে ভালো বলে আর লোকে যাতে খুশি হয়, এই দুটো চিন্তা নিয়ে বনিবনা হয়।

তুমিও একথা বলেছো ?

ওমা তা বলবো না ? আমি কী আর পাঁচজন ছাড়া ?

নিশ্চয়। তোমার সবটাই নির্ভেজাল।

ওই আনন্দেই থাকো। সারাজীবন কতো ভেজালের কারবার চালিয়ে এলাম তার হিসেব আছে ? সেই যে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে'র শরিক হতে নেমে পড়া গিয়েছিলো, তার কতোটা সত্যিই 'দেশমাতার' বন্ধন ঘোচাতে আর কতোটা তোমাদের সঙ্গে জোটবার সুযোগ পেতে তা নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। 'বড়মামা' ছিলেন আমাদের সারা তল্লাটের হিরো। তা সেই বড়মামার প্রশংসাদৃষ্টি পাবার জন্যে জান লড়ে দিতে পারা যেতো। তারপর তো আসরে এসে উদয় হলেন মামার ভাগ্নে। পুলিশের পিটুনি খাবার জন্যে পিঠ পেতে দিতে এগিয়ে না গেলে তোমাদের কাছে 'ঘুরঘুর' করবার ছাড়পত্র পাওয়া যেতো ?

সর্বনাশ ! বলো কী ! এইরকম সর্বনেশে কথা এতদিন পরে ?

'এতোদিন পরে' নিজের মধ্যেই চৈতন্যোদয় ঘটছে। ভেবে ভেবে দেখতে চেষ্টা করি, ধরো সে ভুবনে তুমি নেই, বড়মামা ছোটমামার মহিমা নেই, শুধু সংগ্রামের প্রেরণায় 'সত্যাগ্রহ' করছি, আইন অমান্য করছি—বোধ হয় অমন জোরদার সংগ্রাম হতো না। আসলে প্রেরণার উৎস একজন কোনো মানুষ থাকেই, তা যে কোনো কাজেই হোক। ভগবানকে ডাকতেও গুরুর কাছে ছোটাছুটি। তাই তো বলছিলাম, আমরা নিজেরাই জানি না আমরা আসলে কী ?

তাহলে আর তোমার বড়বৌমার ব্যাপারটা এতো অবিশ্বাস করছ কেন ?

কল্যাণী আস্তে বললো, তাই ভাবছি। কিন্তু ওদের জীবনটা যে বড় সুখের মনে হতো গো।

আমার ছোট ছেলে তথাগতর ধ্যানজ্ঞান হচ্ছে খেলা। নিজে খেলার দিক দিয়ে যায় না, কিন্তু সেই বাল্যকাল থেকে দেখতে পাই, পৃথিবীসুদ্ধ খেলার আর খেলোয়াড়দের জগতের মধ্যেই তার বসতি। পড়তে হয় তাই পড়ে, কিন্তু মনপ্রাণ খেলার মাঠে। দূরদর্শনের কল্যাণে বিশ্বমাঠ দর্শন তো হয়ই।

কিন্তু সেই ছেলে যে হঠাৎ কখন এমন ঝুনো সংসারী খবরটবর জেনে বসেছে তা তো জানি না। দেখে অবাকই হয়ে গেলাম।

সে বাড়ি ফিরে আমায় দেখে খুশী হলো খুব। এবং অত্যন্ত অবলীলায় বলে উঠলো, যাক বাবা, বাঁচা গেল। মার বিরহ ঘুচলো। বাবাঃ, এই কদিন যা অবস্থা! মুখে যেন জগতের চিন্তা।

থাম তো ফাজিল ছেলে।—কল্যাণী ধমক দিয়ে ওঠে। মা-বাপকে নিয়ে ঠাট্টা?

ঠাট্টা! যাঃ বাবা, ঠাট্টা কী গো? 'দিস ইজ ফ্যাক্ট।' তা সত্যি কথাটা ভাবলে দোষ নেই, বুঝলে দোষ নেই, আর উচ্চারণ করলেই দোষ?—

তারপর যেই আমার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কারণটি জেনে ফেললো, ওই ঝুনো কথাটি বলে উঠলো। বললো, তার মানে দাদার হঠাৎ পয়সা আর পদমর্যাদাটা একটু বেড়ে গিয়ে বোধহয় ব্যালেন্স রাখতে পারছে না।—এখন আর মেপেজুপে না খেয়ে আমাপা চালাচ্ছে। কে জানে বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে কিনা!

কল্যাণী বললো, তোর যে দেখছি ক্রমেই মুখের খিল ছিটকিনি উড়ে যাচ্ছে। কী যা তা বলছিস? তোর দাদা ওইরকম?

'ওইরকম' ছিলো তা তো বলিনি, বলছি বোধহয় হঠাৎ পয়সা হয়ে ওইরকম হয়ে গেছে। পয়সা হলেই তো বাবুমশাইরা ধরে নেন, তার একমাত্র সার্থকতা বোতল বোতল বোতলপানে। ওটা আবার আভিজাত্যেরও মাপকাঠি। কে কী 'বোতল' খায় তা দেখলেই বোঝা যাবে লোকটা কী মেকদারের। তাই দাদা—

আমি বলে উঠলাম, তুই এসব কথা এতো শিখলি কবে? কী সূত্রে?

'সূত্র' বলে কিছু নেই। যা দেখে চলেছি। তোমাদের আমলে

জানতে 'মাতাল' হচ্ছে নিন্দনীয়, এখন আর তা কেউ বলে না। বরং যারা সুযোগ পায় বলে বেড়ায়, সে কতোখানি 'মাতাল' হয়, আর তখন তাকে কীভাবে অন্য পাঁচজনে চ্যাংদোলা করে বাড়ি পেঁাছে দেয়।—তো 'বাড়ি' মানে তো 'বৌ'? বৌয়ের যদি ক্রমশ সহ্যের সীমা ভাঙে?—তাছাড়া ড্রিঙ্ক থেকেই আরো কতো কী উপসর্গ এসে জোটে।—অনেক টাকা রোজগার করেও কুলোয় না। তখন ঘুষ খেতে হয়, দুর্নীতি করতে হয়।—আমার তো মনে হচ্ছে বড়বৌদির ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তার উৎস দাদার এইরকম কোনো অবদান!

কল্যাণী রাগ দেখিয়ে বলে, হ্যাঁ, ভারী জ্যোতিষী হয়েছিস তুই! এই তো দূরে বসে দাদার অধঃপতন ধরে ফেলেছিস! কবে আবার তোর দাদা এমন? অ্যাঁ?

আচ্ছা মা, তুমি জানতে না দাদা ড্রিঙ্ক করে?

আরে বাবা, তা কী বলছি? সে তো অফিসের পার্টি-ফার্টিতে অমন করতে হয় জানি।

'করতে হয়' বলে কোনো কথা নেই মা। এমন অনেক মহা মহা বড় বড় অফিসারও আছেন যাঁরা ওর দিকেও যান না। আসলে, 'খেতেই হয়' ওটা ছুতো। তুমি জেনো মা, খুব কট্টর লোককে দেখে চ্যাংড়ারা হাসতে পারে, যথার্থ ভদ্রলোকেরা কখনো হাসে না। যথেষ্ট সমীহই করে।—দাদা তো চিরকালই বাবা একটু আত্মকেন্দ্রিক, ভোগী ভোগী। বাইরে অবশ্য খুবই পোলাইট। তবে সেটা দিয়ে জগতের আর সকলকে ভুলিয়ে রাখলেও স্ত্রীকে ভুলিয়ে রাখা যায় না।

হয়েছে! আসলে ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে তাই জানা নেই। আর তুই দাদাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলি।—তোকে বলে ফেলেই দেখছি ভুল হয়েছে। এখনকার মেয়েরাও অনেকেই বড় বেশী জেদী, তেজী, অনমনীয় হয়। তাদের মধ্যে অ্যাড্জাস্ট করবার ক্ষমতা থাকে না, ইচ্ছেও থাকে না।

হয়তো সেটাও সত্যি মা। আসলে ওই 'অ্যাড্জাস্টমেন্ট'-এর ইচ্ছেটাই সত্যি আর নেই লোকের। তবে আগে মেয়েরা যে সবকিছুর সঙ্গে অ্যাড্জাস্ট করে চলতো, সেটা বাধ্য হয়ে। 'নিরুপায়তা'ই তার কারণ। কিন্তু এখন—

আমি হঠাৎ আমার ছোটছেলেকেও যেন নতুন দেখছি। ওই বা কবে কখন এতো কথা শিখলো? আসলে বোধহয় আমারই অন্যমনস্কতা। সেই যে হাফ্‌প্যান্ট পরা বয়েসের মাপটা, সেটাই মনের মধ্যে গেঁথে রেখে দিয়েছি। খেয়াল করিনি—ওদের ওপর দিয়ে গঙ্গার কতোটা জল গড়িয়ে চলেছে। আর তা থেকে কী ধরনের মতবাদ আহরণ করে পুষ্ট হচ্ছে।

তবু বললাম, শুধু নিরুপায়তাই? ভালোবাসা বলে কোনো জিনিস নেই? ভালোবাসাই কী পরস্পরের মধ্যে অ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট এনে দেয় না?

ভালোবাসা?--ওঃ!

আমার ছোটছেলে অতি অবলীলায় বললো, ও জিনিসটা তো ক্রমশ 'আকবরী মোহরের' মতো হয়ে যাচ্ছে বাবা।—আজকের যুগে —তোমাদের আমলের মতো 'ভালোবাসা' নামের একটা বৃহৎ জিনিস! লোকেরা-তোমরাও 'দেশ' কে ভালোবেসে সর্বস্ব ত্যাগ করেছ। এখন আর দেখছ তা! 'দেশ' যে একটা জিনিস এবং ভালোবাসবার তা কারুর মনেই আছে কিনা সন্দেহ। 'নিজেকে' প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য ক'জনেরই বা আছে? এই যে খেলার জগতেই দেখো না। আগে না কী 'খেলা'কে শুধু 'ভালোবেসেই' খেলার জগতে ছুটে আসতো। স্বার্থচিন্তা বলে কিছু থাকতো না। জীবনপাত করেছে খেলার উন্নতির জন্যে। এখন আর সে জিনিস আছে? এখনও শুধু 'খেলা'কে ভালোবেসে আত্মোৎসর্গ করতে কজনকে দেখবে? বিশাল একটা পলিটিক্যাল চক্র। খেলার আড়ালে লাখ লাখ টাকার খেলা।—

কল্যাণী মাঝপথেই তাড়া দিয়ে ওঠে, সেরেছে। খেলার জগতের কথায় এসে হাজির হলি? তা হলে তো আজ আর রাত বারোটার আগে খাওয়া-দাওয়া হবে না। চল চল খেতে দিইগে। অনেকদিন পরে আজ আবার তিনজনে—

ছোটছেলে ভুরু কুঁচকে বললো, অনেকদিন পরে মানে? বাবা মাত্র গত সপ্তাহেই গিয়েছিলেন না?

গত সপ্তাহে কীরে?

কল্যাণী বলে, দু দপ্তাহ পার হয়ে তিন সপ্তাহ পড়লো যে রে।

এ কথার উত্তরের আগেই নীলোৎপলের বিশু এসে নম্রভাবে জানালো, পিসিমা, আপনার ফোন।

হ্যাঁ, কল্যাণীকে বিশু 'পিসিমা'ই বলে। আর নরনারায়ণকে বলে 'পিসাবাবু'।

কল্যাণী অবাক গলায় বলে, আমার ফোন! আমায় আবার কে—

তথাগত তাড়া দিয়ে বলে, 'তোমায় আবার কে' সেটা গিয়ে ধরলেই ধরতে পারবে। কেন, তুমি কী এমনি অভাগা যে জীবনেও তোমার একটা ফোন আসতে পারে না?

কল্যাণী ততক্ষণে ছুটে চলে যায়।

কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই চলে আসে। না, কোনো পুরনো বান্ধবী-টান্ধবী নয় যে—হঠাই পাকড়ে ফেলে, বারোটা বাজিয়ে দেবে।—ফোন করেছিলো কল্যাণীরই মেজছেলের বৌ।

কেন? কী হলো হঠাৎ?

তা হয়তো হঠাৎই। আবার হয়তো হঠাৎও নয়। কার্যকারণ সূত্র আছেই একটা।

কল্যাণী হতাশভাবে এসে পড়ে যা বললো, তার সারার্থ এই, বাবলি খুবই দ্রুতভাবে বলেছিলো, অন্য একটা বাড়িতে এসে ফোন করছি—এক মিনিট।—তিস্তাদির ব্যাপারটা হয়তো বাবার মুখে কিছুটা শুনে থাকবেন। তো জানাচ্ছি—তিস্তাদি এসে পড়েছে ঘণ্টাখানেক হলো। বলছিলো, ও চায় না আপনাদের কারো সঙ্গে দেখা হোক! সেটাই জানিয়ে দিচ্ছি।

কল্যাণী নাকি বলতে চেষ্টা করেছিলো, ও যে এসেছে সেটা আর আমরা জানতাম কোথা থেকে? তুমি বললে তাই! না বললে তো—

কথা শেষ হবার আগেই ওদিকে রিসিভার নামিয়ে রাখবার আওয়াজটুকু শুনতে পেয়েছিলো।

শুনে অবাক হলাম, অন্য কথা ভেবে। আজই এসে গেল? বলেছিলো 'প্লেনের টিকিট পেলে—' হয়তো সে টিকিট হাতের মুঠোয় রেখেই চিঠিটা লিখেছিলো।

আমার ছোটছেলে দু-হাত উল্টে বললো, যাঃ বাবা! মেজদা

কোম্পানী হঠাৎ বড়বৌদির পার্টি হয়ে গেল কী করে? ওখানে উঠবেন, থাকবেন, অথচ আমাদের সঙ্গে--একদম কাট আপ! আমরা আবার কখন ও'র পাকাধানে মই দিতে গেছি?

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হলো একটু আগের মনোভাবটা যেন বদলে গেল। তার পাষণ্ড পামর দাদা আর 'নির্যাতিতা বড়বৌদির' সম্পর্কে মনোভাবটা ঠাঁই বদলে বসলো।

না, এ বাড়ির কেউ ওর সঙ্গে দেখা করবার শখ করেনি।

'দূরভাষিণী' মারফতও আর কোনো খবর আসেনি ওদিক থেকে।

তবু খানিক খানিক খবর কানে এসেও যাচ্ছে।—খবর হাওয়ায় ভাসে! খবর কানে হাঁটে।—কে যে কখন কোথা থেকে একটুকরো একটুকরো খবর সাপ্লাই করে বসে।—তবে একটা প্রধান 'লাইন' হচ্ছে নীলোৎপল ডাক্তারের রুগীর ঘর। বুড়ো হয়ে যাওয়া ডাক্তারের 'বাঁধা' রুগীর ঘর' বিস্তরই। তাঁদের সঙ্গে প্রায় আত্মীয়তাই ঘটে গেছে।—এমন 'বিস্তরের' মধ্যে আবার কেউ কেউ ডাক্তারের হাঁড়ির খবর রাখেন। কাজেই তাঁরা ডাক্তারের আজীবনের লোকসানের খাতা ভাড়াটেদেরও ভালোই চিনে ফেলেছেন। তাঁদের অনেকেই হয়তো এমনও আছেন যে, সেটা নিয়ে রীতিমতো যন্ত্রণাই বোধ করেন।— একটা ভালোমানুষকে পেয়ে অপর জনেরা তাঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইছে, এ দৃশ্য কারই-বা সহ্য হয়?—

তো ডাক্তারের এমনি সবজান্তা এক রুগীর ঘর থেকেই প্রথম এসেছিলো খবরটা। মানে, তাঁরা কেমন করে যে এই ভাড়াটেদের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে ফেলেছিলেন জানি না। তবে তাঁদের কারো কাছ থেকে খবর সরবরাহ হয়ে আমরা জানলাম, তিস্তা চৌধুরী স্বামীর নামে কোনো কড়া অভিযোগ করে মামলা দায়ের করেননি। দায়েরের কারণটা হচ্ছে, সেই প্রতিপক্ষ 'পতি'টি নাকি জীবনে আপন কেরিয়ার গড়ে তোলার তালে থাকা ছাড়া আর কোনো দিকে তাকান না, আর কিছু জানেন না। অতএব তিনি সর্বদাই কাজে ব্যস্ত। কী বাইরে, কী ঘরে।—যে লোক বাড়িতে থাকার ঘণ্টা কয়েক মাত্র সময়ও বাড়িতে অফিসের ফাইল আর নথিপত্র নিয়ে এসে তার মধ্যে ডুবে থাকেন, কতোদিন তাঁর সঙ্গে ঘর করা সম্ভব?

স্ত্রী একটা রক্তমাংসের মানুষ তো ? সে তোমার বাড়ীর শোভা-বৃদ্ধিকারী আসবাবপত্রের একটা অংশ নয় নিশ্চয়ই।—নিঃসঙ্গতার শিকার হতে হতে সে ক্রমশ পাগল হয়ে উঠেছে।—একটা ছেলে, তাকেও কাছছাড়া করে দূরে রাখতে বাধ্য হতে হয়েছে, কারণ তারও তো কেরিয়ার গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে !

তবে ? একা মহিলা, যার নিজের কোনো কর্মজীবন নেই, সে হাঁপিয়ে উঠবে না ?

কিন্তু নিজের কর্মজীবন নেই বা কেন ?

সেখানেও ওই উন্নাসিক পতিদেবতার বাধা ! তিনি একটা কেষ্টবিষ্টু লোক আর তাঁর স্ত্রী যাহোক তাহোক একটা চাকরি করবে ?—

অথচ ওই যাহোক তাহোকের বেশী বিদ্যে তার পেটে নেই।…তবে আর কী করা ? 'ফুলদানীর ফুলের তোড়া' হয়ে শুধু বসে থাকো।

নাঃ। সেটা থাকা যাচ্ছে না।

অতএব—

শুধু 'লোনলি ফীল্' !

কেবলমাত্র নিঃসঙ্গতাবোধ।

এইজন্যে একটা সসন্তান দাম্পত্যজীবনকে ভেঙে দেওয়া চলে ?

কল্যাণী বললো, হ্যাঁগো, শুধু এই 'কারণ' দর্শিয়ে কেস ঠোকা যায় ?

বললাম, কী জানি। কখনো তো ও-পথ দিয়ে হাঁটিনি। কিসে কী হয় কে জানে ! আমার তো ধারণা ছিলো, এরকম ক্ষেত্রে বানিয়ে বানিয়েও অপর পক্ষের গায়ে কালি ছিটোতে হয়। মিথ্যে করে নানা দোষ আবিষ্কার করতে হয়। তবেই নিজের দিকটা জোরদার হয়।

আমার ছোটছেলে তাড়াতাড়ি বললো, না না, এখন আর অতোসব কিছু করতে হয় না। এখন আইন অনেক উদার হয়ে গেছে। তার বজ্র আঁটুনির গিঁট এখন অনেক আলগা। এতেও হয়।

আমি যতোই দেখি আর অবাক হই। আমার ছেলেরা এতো কম

বয়েসেই কতো জানে, কতো বোঝে। আমি তো ছাই এই বাহাত্তরে এসে ঠেকু ঠেকু হয়েও সিকিও জানি না।

স্ত্রীকে 'নিঃসঙ্গ রাখা' একটা মারাত্মক অপরাধ তা জানতাম না। কাজপাগল লোক তো থাকেই।

তা স্ত্রীকে অভাবগ্রস্ত রাখাও তো কম অপরাধ নয়। তবে? এ সংসারে 'অর্থ আর সামর্থ্য'—এই দুটো বস্তু যে দাঁড়িপাল্লার দুটো পাল্লায় চাপানো থাকে সেটাও তো ঠিক?

অর্থ আহরণ করতে হলেই সামর্থ্য ব্যয়।

আর 'সামর্থ্য' মানেই তো 'সময়'। তাই নয় কী? স্ত্রীর বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, যথেচ্ছ আরাম আয়েস এবং বিলাসবহুল জীবন চাই, আবার সেই জীবনটিকে যে আহরণ করে এনে তোমার চরণে সমর্পণ করবে, তাকেও সর্বদা কাছে পাওয়া চাই!

আশ্চর্য তো!

কী আর বলবো। বলবার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু আমার বড়ছেলেটার অবস্থাটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করছি।—

কথাটা ঠিক। আমরাও ওর ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি 'ওপরে ওঠার চেষ্টাটাই' ওর ধ্যানজ্ঞান প্রাণ! তো তিস্তার বাবাও তো সেই পলতেতেই দেশলাই কাঠিটি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক দুম্ করে মারা গিয়েই—বেয়ানও তো মারা গেছেন জানলাম।—একটা জ্বলজ্বলাট পরিবার হঠাৎ কীরকম নিভে যায়।—অথচ এসব দেখেও লোকের একটু চিন্তা-চেতনা আসে না।

ভাবছি—এই যে তিস্তা, যাকে আমি এখনো মনে মনে 'বড়বৌমা'ই ডাকি, সে তার নিজের ছেলেটার কথাও তো একবার চিন্তা করবে? নিজের 'নিঃসঙ্গতাই' এতো অসহনীয় মনে হচ্ছে, অথচ ছেলেটার মনটার কথা মনে পড়ছে না!——

চিরকালই জানি, আমরা এ বাড়ির ভাড়াটের ভাড়াটে।

নীলোৎপল ডাক্তার যে কবে কখন তার চিরকালের বাড়িওয়ালার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিয়ে রেখেছিলো, তা জানতাম না। হঠাৎই

মনে হাসি কিন্তু কই বিদ্বেষ ? তিক্ততা ? ঘৃণা ? অবজ্ঞা ? মনের মধ্যে হাতড়েও খুঁজে পাই না তো।—কল্যাণীর মধ্যেই কী তার প্রকাশ দেখি ? কই কল্যাণী তো প্রসন্ন মনেই তার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের আত্মীয়টিকে যত্ন-আত্তি করে।

অথচ আমার ছেলেরা ? আগে তিন ছেলেই, এখন একাই ছোট-ছেলে। বটাই এলেই এমন ভাব করে, যেন একটা ঘেয়ো কুকুর পাঁক থেকে উঠে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।—

মায়ের 'যত্ন-আত্তির' দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায়, এবং পরে তূণ থেকে তীক্ষ্ন তীক্ষ্ন ব্যঙ্গবাণসমূহ বার করে মাকে বিন্ধ করে। আর বাপকে ? টাকাটা দিয়েছি সেটা আমি চেপে যেতে পারি, তবু নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছা করে না, তাই চাপা হয় না। কাজেই সেখানের জন্যে থাকে ব্যঙ্গহাসি ধিক্কার।—

লোকে যে আমায় বোকা পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নেয়, তা বলে বলে গায়ের ঝাল মেটায়। যদিও টাকাটা ওদের পকেট থেকে যায় না। তবুও—

কল্যাণীও ছেলেদের সঙ্গে কৌতুক করে। তবু বলে, আরে বাবা, প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব সেণ্টিমেণ্টের ক্ষেত্র থাকে।

কল্যাণী সেটা বোঝে। ইচ্ছে করলে না বুঝলেই পারতো। তবু সে ইচ্ছে করে না। অথচ আমার ছেলেরা—

মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে ওদের মধ্যে এমন বিদ্বেষের সঞ্চয় এলো কোথা থেকে ?—এ কী কালের হাওয়ার গুণ ! এই যুগ শুধু বিরাগ বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষের সঞ্চয়ের পুঁজিই ভরে তুলেছে। 'ভালোবাসা' নামের জিনিসটার জন্যে আর জায়গা রাখতে পারছে না। ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

যেমন সংকীর্ণ হয়ে আসছে মানুষের বসবাসের ঠাঁইগুলো। বড়লোকের 'তিনমহলা অট্টালিকা', 'চকমিলোনো ঘরদালান, বারান্দার' কথা তুলছি না, গেরস্হবাড়িতেও ছিলো বৈকি কিছু কিছু। জৌলুস না থাকুক, জায়গা ছিলো। ছিলো 'দালান' 'ঘরদালান' 'রান্নাঘর' 'ভাঁড়ার ঘর' 'পুজোর ঘর' 'দাওয়া' 'উঠোন' 'বারান্দা' 'ছাদ' 'সিঁড়ি' 'চিলেকোঠা' 'চোরকুঠুরি' সব শব্দসমূহ। এমন কি 'বৈঠকখানা' নামেও একটা

ঠাঁই নির্দিষ্ট ছিলো।

তাই হয়তো হৃদয়টাও ছড়ানো ছিটোনো ছিলো। চটাওঠা মেজে, প্লাস্টার খসা দেওয়াল, তা হোক, তবু পাঁচটা 'আত্মজন' এসে পড়লে তার মধ্যেই ঢুকিয়ে নেওয়া যেতো। এখন মাপাজোপা 'এতো স্কোয়ার ফিটের' ঘেরের মধ্যে সে প্রশ্ন থাকে না। সেখানে ডাইনিং স্পেস থেকে, 'ব্যালকনি'টুকু পর্যন্ত নিরুচ্চার উচ্চারণে বলে চলেছে, 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।'

এখন 'ছাত' বলে গেরস্থর কোনো অধিকৃত ভূমি থাকে না। 'সিঁড়ি'? সে তো ভাগের মা। অতএব 'চিলেকোঠা' 'চোরকুঠুরি' ওইসব নামের শৈশবের সেই রোমাঞ্চকর জায়গাগুলোর আর দর্শন মিলবে না কখনো। পুরনো পুরনো বাড়িরাও তো আজকের যুগের ছাঁচে ঢালাই হতে দেহরক্ষা করে চলেছে। কোনো বাড়িতে কোথাও আর অলিগলি পথ, ভুলভুলাইয়া বারান্দা, দু-তিন দফা সিঁড়ির দাক্ষিণ্যে পথ হারিয়ে ফেলা—এসব আর থাকবে না শিশুর জন্যে। না কোথাও কোনোখানে একছিটে বাহুল্য ভূমি থাকবে না আর। তবে হৃদয়ই-বা গুটিয়ে আসবে না কেন? সে কেন দরাজ থাকবে? ছোট হয়ে আসছে তো সবকিছুই। ব্যবহারের জিনিসগুলোও। 'কাঞ্চননগরের বগিথালা', 'জামবাটি' 'ঢাকেশ্বরী কাঁসি' এসব শব্দ মৃত অতীতের ঘরে জমা পড়ে গেছে। আজকের কেউ ওসবের নামও জানে না। অবশ্য জানাতে বসলেও হেসে উঠে সেকালের গায়ে ধুলো দিতে চাইবে। 'জামবাটি'তে করে পুরু সরপড়া ঘন দুধ খেতেন বাড়ির কর্তা? অ্যাঁ? ওই সেই 'বগিথালা' নাকি, তার ধারে পাশে দু-সারি বাটি সাজিয়ে বত্রিশ রকম তরকারি? 'বকরাক্ষস' নাকি?—এতো খেয়ে খেয়েই পরবর্তীকালের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারেননি। আমাদের কমই ভালো। ছোটই ভালো।' না, সবকিছু 'ছোট' হয়ে যাচ্ছে বলে কেউই দুঃখিত নয়।—আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই যে পুরাণের গপ্‌পোয় কিংবদন্তী আছে, একদা মানুষ নামের প্রাণীটা ছিলো চোদ্দ হাত লম্বা, পরবর্তীকালে ছোট হতে হতে হয়ে পড়লো সাত হাত, আর আরও পরে ক্রমানুসারে সাড়ে তিন হাত, এ কিংবদন্তীকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে না দিলেও বোধহয়

চলে।—কে জানে ওই নিয়মে ক্ষইতে ক্ষইতে মানুষ ক্রমশ আড়াই বিঘতে পৌঁছবে কিনা।

আমার ছোটছেলে তথা বা তথাগত যখন নেহাত ছেলেমানুষ তখন ওকে গল্পচ্ছলে এ কথা বলেছিলাম। মনে আছে, তাতে ও হাততালি দিয়ে হেসে উঠে বলেছিলো, 'তাহলে তো খুব মজাই হবে। বাস-গুলোকে তাহলে তখন খুব ছোট্ট ছোট্ট করে বানালেই চলবে। রাস্তায় জ্যাম হবে না। কম কম জিনিস খেয়েই পেট ভরে যাবে লোকের, বেশী পয়সা খরচ হবে না।'

শুনে তখন অবশ্য শুধু হেসেই ছিলাম, কিছু ভাবতে বসিনি। এখন ভাবতে বসছি। এই প্রজন্ম সমস্যা সমাধানে সহজেই তৎপর হতে পারে। মানুষ মাপে 'ছোট' হয়ে যাওয়ার কল্পকথায় এরা দুঃখিতও হয় না, বিচলিতও হয় না। বরং তার মধ্যে একটা 'মজা'ই দেখতে পায়। ওই কল্পকথা বা গল্পকথা যদি সত্যিই হয়, মানুষ ক্রমানুসারে আড়াই বিঘতে পরিণত হয়, তাহলে তো 'মজাই'। মানুষের কম কম খাওয়ার দরুন খাদ্য বাঁচবে, পয়সা বাঁচবে। ছোট্ট ছোট্ট গাড়ি-বাড়ি বানিয়ে ফেলে জায়গা বাঁচবে। বাঁচবে ভিড় যানজট অসুবিধে।

অন্য আরো কিছু বাঁচবার প্রশ্ন আছে কিনা এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না এরা। তার মানে এদের কাছে 'বাঁচবার' একমাত্র মানে হচ্ছে অবস্থাকে ম্যানেজ করে ফেলতে পারা।

এখন এই সাড়ে তিন হাত মাপের যুগেই তো এমন বাসগৃহের পরিকল্পনা, যেখানে হঠাৎ কোনো প্রিয় অতিথির আবির্ভাব ঘটবার সম্ভাবনা ঘটলে, সঙ্গে সঙ্গে গৃহে অবস্থিত নিতান্ত সম্মানিত অতিথিকেও 'পথ দেখবার' নির্দেশ দিতে হয়।—তা তাতে কী? ম্যানেজ করা নিয়ে কথা! তবে ওই ম্যানেজ করার খাতিরে নিজেদের প্রয়োজনকে সংকুচিত করার চিন্তা অবশ্য মাথায় আসে না এদের। যেটা আমাদের আমলে প্রথমেই আসতো।

সেকাল জানতো, অন্যের জন্যে প্রয়োজন প্রসারিত করার দরকার হলে, সর্বাগ্রে আপন প্রয়োজনকে সংকুচিত করে ফেলতে হয়। একাল অমন অদ্ভুত কথা ভাবে না।

আমি অবশ্য আমার মেজছেলের বাড়ি থেকে—'পথ দেখার' ইশারা পেয়ে মান-অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে এসব ভাবতে বসিনি। আমি তো বরং চলে আসবার একটা সুযোগ পেয়ে বেঁচেই গেছলাম। আমার তো কল্যাণীর জন্যে খুব মন কেমন করছিলো।—এসব ভাবছি শুধু এ যুগের জীবন দর্শনের পার্থক্য তুলনা করে। তুলনামূলক সমালোচনা নয়, শুধুই তুলনা।

আমার বড়ছেলে বড়বৌয়ের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা কতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে, এ খবর আর জানতে পারিনি। তার জন্যে আর তেমন অশান্ত ব্যাকুলতাও অনুভব করছি না। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে

লোকলজ্জা? পরিচিত সমাজে মাথা হেঁট?

আমার ছোটছেলে বলেছিলো, আছো কোথায়? এসব তো এখন ঘরে ঘরে। কে কাকে লজ্জা দেবে?

সেদিন রাগ করে বলেছিলাম, ঘরে ঘরে? কই, তোর আমার চেনাজানা ঘরগুলো খুঁজে দেখ তো? কোথায় এমন ঘটনা?

ও হেসে উঠেছিলো। বলেছিলো, আমরা তো কুয়োর ব্যাঙ। আমাদের জানা জগতের পরিধি তো ওই কুয়োর জলটুকু।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও এই কুয়োর পরিধির মধ্যে থেকেও মহাসমুদ্রের খবর রাখে কী করে?—আমার তো ধারণা ছিলো 'খেলার জগৎ' ছাড়া আর কোনো জগৎ সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই। আমার বড়ছেলের জীবনের বিপর্যয় আমার ধারণার, জগৎটাকে যেন নাড়া দিয়ে চমকে চমকে দিচ্ছে!

তবু ওদের জন্যে ততো নয়, সেই ছোট্ট ছেলেটার জন্যে প্রাণটা কেমন করে ওঠে। কল্যাণী নিজস্ব খাতে যার নাম রেখেছিলো 'ভোলামহেশ্বর'। গোলগাল ফর্সা ধবধবে সেই ছেলেটাকে যেন 'দেবশিশু দেবশিশু' দেখতে লাগতো। অবশ্য কতই-বা দেখেছি? যখন ওর বাবা ছুটিতে কলকাতায় আসতো, মাত্র দু-চার দিনের জন্যে। পুরো ছুটিটা তো তিস্তা বাপের বাড়িতেই থাকতো।—বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর আর কলকাতায় এসেছে কই?—ওর অমন জমজমাট বাপের বাড়িটা হঠাৎ অমন কর্পূরের মতো উবে গেল কী করে?

টের পেলাম একদিন। লোকটা একদিন এসে বিনা ভূমিকায় বলে উঠলো, আপনার একটি ছেলেও তো ডাক্তার হলো না জামাইবাবু, এটাই আপসোসের। আশা করতাম হয়তো তথাগত এ লাইনে আসবে।

আমার ছেলেদের ডাক্তার না হওয়ায় ওর আপসোস কিসের ঠিক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি। বললো, মানুষের শরীর, বলা তো যায় না। ডাক্তার বলে তো আর যমে ছাড়বে না? তাই আগে থেকেই একটু আধটু গুছিয়ে কাজ করতে চাইছি।—এই বাড়িখানা আমি ছোটবাবুর (অর্থাৎ তথাগত) নামে লেখাপড়া করে রাখছি—শুধু একটা অনুরোধ, চেম্বারটা যদি রাখে কোনো ডাক্তার বসিয়ে। অনেক হতভাগা আসে তো!

কথাটা ঠিক, নীলোৎপলের সকালের সমস্ত রোগীই দাতব্যের। সকাল সাতটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত চলে এই দাতব্যকর্ম।—কিন্তু তার সঙ্গে আমার ছেলের কী সম্পর্ক? আর বাড়িওয়ালার বাড়িটা ও লেখাপড়া করে দেবার কে?

অবাক হয়ে বললাম, বাড়িটা লেখাপড়া করে দিচ্ছেন? হঠাৎ একটা ধাঁধা নিয়ে হাজির হলেন যে? বাড়িটা কী আপনার বাড়িওয়ালা সদ্‌ব্রাহ্মণ পেয়ে আপনাকে দান করেছে না কী?

নীলোৎপল ডাক্তার একটু হাসলো। বললো, তা প্রায় তাই। নামমাত্র দক্ষিণাতেই দান। বুড়ো ভদ্দরলোক মরার আগে আমায় নিজেই অফার করেছিলেন, বলেছিলেন, এতোদিন ধরে যা ভাড়া দিয়ে এসেছেন, তাতেই তো বাড়ির দাম উঠে গেছে। এটুকু যা নিতে হচ্ছে ছেলেবেটাদের গোঁসার ভয়ে। ব্যাটাদের বাপের এই শহরে আরো চারখানা বাড়ি আছে, তবু খাঁই কমে না।—তো সেই একসময় আর কী জিনিসটা আপনার ডাক্তারের হয়ে গেছে। কিন্তু তারই বা এ ভুবনে কে আছে বলুন? ওই ভাগ্নেরা ছাড়া?

যদিও কল্যাণী কোনোদিন নীলোৎপলকে দাদা বলে না, তবু নীলোৎপল কথাসূত্রে ওদের ভাগ্নেই বলে। বোধহয়—আমাকে 'জামাইবাবু' ডাকের সূত্রে।

তাই বলে বাড়ি লেখাপড়া?

আমি শিউরে উঠে বলি, সর্বনাশ। এসব আপনি কী বলছেন?

মাথা খারাপ নাকি? পাগলামি করবেন না। আর হঠাৎ 'জীবন নশ্বর' এমন কথা মনে আসছে কেন? কই আমার তো আসে না?

ডাক্তার হাসলো। বললো, জীবন যে কতো নশ্বর তার বড় বেশী প্রত্যক্ষদর্শী তো এই অভাগা ডাক্তাররা।—তাছাড়া মাঝে মাঝেই হৃদ্‌যন্ত্রে একটা গোলমাল টের পাই। সেটা যে কোনো মুহূর্তে—

চুপ করে একটু হাসলো।

বললাম, ওসব কিছু না। অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন তাই। তাছাড়া—তথা কী এতে রাজী?

ডাক্তার হঠাৎ আমার হাতের ওপর একটা হাত রেখে গাঢ়স্বরে বললো, সেটাই তো পরম সন্দেহ।—তাই আপনাকে ভার দিচ্ছি রাজী করাতে। চেম্বারটার জন্যেই—

আমি হেসে উঠলাম। পাগল আপনি? আমি কে? ওদের কাছে আমি? বরং কল্যাণীকে বলে দেখুন।

কল্যাণী!

নীলোৎপল মাথাটা নাড়লো।

বললো, সাহস হয় না।

ওকে আপনার এতো ভয়?

জীবনে সত্যিকার ভয় যদি কাউকে করে থাকি—তো সে ওকেই।

বলে আর একটু হাসলো ডাক্তার।

কিন্তু আপনার এই প্রস্তাবটা যে একদম অ্যাবসার্ড!

নীলোৎপল একটু তাকিয়ে থেকে বললো, একদম অ্যাবসার্ড!—অথচ সামান্যতম সামাজিক নিয়ে সম্পর্ক যদি থাকতো তাহলে স্বাভাবিকই হতে পারতো, তাই না?

এর আর কী উত্তর দেবো?

তাই বলি, শরীরের দিকে একটু যত্ন নিন দিকি। ওসব আজেবাজে চিন্তা ছাড়ুন। আপনি নিজেই এখনো অনেকদিন চেম্বার চালাতে পারবেন। আমার তো মশাই, 'কোনোদিন মরতে পারি' এ বিশ্বাসই আসে না। স্থির ধারণা, ছিলাম। আছি। থাকবো।

ও একটু হাসলো, আপনি মহাপুরুষ।

হ্যাঁ, নররূপী নারায়ণ তো।

তখনকার মতো ঠাট্টা তামাশায় কথা শেষ হলেও—একসময় কল্যাণী আর আমার ছোটছেলের সামনে কথাটা পাড়তেই, হেসে হেসেই অবশ্য পাড়লাম, কল্যাণী বললো, ও লোকটারও ভীমরতি হয়েছে।

আর ছেলে বললো, এমন অবাস্তব প্রস্তাব ওঁর মতো লোকের পক্ষেই সম্ভব। চিরদিনই তো একটা অবাস্তব জীবন কাটিয়ে এলেন! ওর উচিত বাড়িটাড়ি টাকাকড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে দান করে রাখা! যেটা সভ্যতা। তা নয়—পাতানো ভাগ্নেকে—রাবিশ!

আমার ছোটছেলের সমস্ত ভঙ্গিতে একটা বিদ্বেষ আর তিক্ততা ফুটে ওঠে। বেশ বোঝা যায়, এ তিক্ততা কেবলমাত্র আজকের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নয়। পুঞ্জীভূত ব্যাপার।

আমি ভয়ে ভয়ে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকালাম। সেখানে কী 'অপমানাহতের' ছাপ ফুটে উঠবে? কিন্তু কই? কল্যাণী অনায়াসে ছেলের স্বরে স্বর মিলিয়ে বলে উঠলো, যা বলেছিস! একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি মাথায় এলো না। চিরকেলে বুদ্ধু তো!—ভাগ্নেকে বাড়ি দিয়ে যাবো! ভাগ্নে আমার ডাক্তারখানা দেখবে! হাসবো না কাঁদবো! লোকটা চিরদিন ঘাসে মুখ দিয়েই চললো।

সাধে বলি কল্যাণীকে আমি আজ পর্যন্ত চিনতে পারলাম না, আমার ছেলেদেরকে তো জলের মতোই বুঝতে পারি। নিজের মায়ের অন্ধভক্ত প্রেমিককে কে আর প্রেমচক্ষে দেখে? সত্যি বলতে আমার ছেলেদের বৌদেরও যেন কিছুটা বুঝতে পেরে উঠছি। কিন্তু—নিজের বৌকে নয়।

কিন্তু হিসেব করলে—নিজেকেই কী ঠিকমতো পারি? হিসেবমতো আমারও তো ওই বুদ্ধুটার বিদ্বেষ বিরাগ আসবার কথা। অথচ চিরকাল ওর ওপর আমার শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি!

তো আমারই বোধহয় বুদ্ধিতে কোথাও গড়বড় আছে। তা নইলে সেই আমার প্রবল প্রতাপ পিতামহ, যাঁর অহমিকার দাপটে আমার মার আর আমার জীবন কেন্দ্রচ্যুত পরাশ্রয়ে কেটেছে। যদিও আমি

অহমিকার বশেই স্বেচ্ছায় নিজ অধিকারের আশ্রয় ত্যাগ করেছিলাম, তবু সেই অন্যায় প্রতাপশালী লোকটার প্রতি কোনোদিন সেভাবে বিদ্বেষ আসেনি। বরং তার ওই দাপুটে জীবনের শেষ শোচনীয় পরিণতির কথা মনে করলে দুঃখই আসে। আর লোকটার মৃত্যুকালে যে দেখা হয়নি সে আক্ষেপও এযাবতকাল রয়েই গেছে।

আবার এমন কী 'বটাই'কে দেখলেও আমার কেমন যেন একটা সকৌতুক স্নেহই আসে, বিদ্বেষ বিরাগ তিক্ততা নয়। এসেই তো প্রথম কথা বলে, 'কিছু টাকা তো ছাড়তে হবে নাড়ুকাকা। তোমাদের পিতৃপিতামহের ভিটেখানা যা নড়বড় করছে! কোনদিন না মুখ থুবড়ে পড়ে। রক্ষার যে তোমাদেরই ডিউটি। আমার কী।'—

আমার ওই 'ডিউটি' বাবদ দেয় টাকাটা যে আমার পিতৃপিতামহের ভিটের কাছ বরাবরও পৌঁছয় না তা ভালোই জানি। তবু না দিয়েও পারি কই? ও যতোটা চায় ততটা না হলেও কিছুটা দিই বৈকি।— জানি, এ টাকা ওর পোশাকের পারিপাট্য, সর্বদা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবার পারানি, আর নেশাভাঙেই যাবে, তবু মায়া হয়। অভাবগ্রস্ত বলেই তো এতো গল্প ফাঁদে।—আমার গেলবারের দেওয়া টাকাটা দিয়ে ভিটের কোনখানটা সংস্কার করিয়েছে, সে গপ্পো করে, শেষমেষ আপসোস করে, গেলে না তো একবার? তাহলে তবু এখনো দেখতে পেতে!

বলি যাবো। যাবো একবার।

বটাই অনায়াসে আমার মুখের ওপর বলে, আর কবে যাবে খুড়ো? চড়ি ওলটালে? বলি ভগবানের দয়ায় এখনো তো তবু 'চক্ষুছরদ' রয়েছে। আর কতোদিন থাকবে? তোমার মতন বয়েস হলে আমরা তো বুকে হাঁটবো।—এই যে খুড়ি। এখনো দেখলে মনে হয় বয়সকাল পেরোয়নি। অথচ ওনার ভাসুরপো বৌটিকে দেখুন? এখনি হাড়বুড়ো। তো তোমাদের উচিত একটু শক্ত থাকতে থাকতে একবার যাওয়া!

আমরা গেলে যে বটাই কৃতার্থ হবে এমন কথা মনে করি না আমরা। আমিও না, কল্যাণীও না। জানি, ওইসব বলে খাতির জমানো, আত্মীয়তা বন্ধনের প্রমাণ রাখার চেষ্টা। এবং মনে জানে, 'রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না।' তবু বলে। মনে

পাঠিয়ে দিয়ে দেশছাড়া হয়ে চলে গেলি। ছেলেকে কি চিঠিও দিস না ?

বাঃ! তা কেন ? মানে চিঠি আর কী, গ্রীটিং কার্ডটার্ড দেওয়া হয়েছে। সে তো একসঙ্গেই। ঠিকানা-ফিকানা ওর মা-ই লেখেটেখে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। একবারও 'তিস্তা' নামটা উল্লেখ করছে না। যেটা উঠতে বসতে করতো।

কল্যাণী একটু চুপ করে থেকে বললো, সব দায়িত্ব একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে, সেই 'একজনের' মধ্যে বিদ্রোহ আসা অসম্ভব নয়।

বুদ্ধ বসেছিলো, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত গলায় বলে, 'চাপিয়ে' দিয়ে মানে ?—কেউ যদি সবটা নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে চায়, ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় আছে ?

ওদের মা-ছেলের মধ্যে আমি আর মাথা গলাচ্ছি না, এবং এখন তথাগতও বাড়ি নেই যে ফোড়ন কাটবে। তাই কল্যাণীও ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলে, নিজের ত্রুটি অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারলে অবশ্য বেশ সুবিধে।—কিন্তু তোর নিজের মা-বাপকে একটা চিঠি লেখাও তো তোর দ্বারা হয়ে ওঠে না বাবা। সেটাও কী সেই 'একজন' নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চেয়েছিলো ?

বুদ্ধ আবার বসে পড়ে।

চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে, প্রত্যক্ষে না চাইলেও পরোক্ষে চাওয়া যায়। আমি বাড়িতে যে চিঠি লিখবো, সেটা তাঁকে না দেখিয়ে পোস্ট করে ফেললে রক্ষে থাকে ? কী যেন অন্যায় কাজ করেছি!—কেউ যদি আমার লেখা চিঠিটা আগেভাগে পড়ে নেয়, তার 'ক্রিটিসিজম' করে কারেকশান করতে বলে, লিখতে ইচ্ছে হয় ? অথচ তিনি গোছা গোছা চিঠি লিখছেন, কাকে কোথায় জিগ্যেস করলেও মহা অপমান। আগে পড়া তো ভাবাই যায় না।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না, বলে ফেলি, তা তুমি তো অফিসে বসেও নিজের চিঠিপত্র লিখতে পারো!

অফিসে বসে ? হুঃ।

বুদ্ধ আবার উঠে পড়ে পায়চারি করতে থাকে। এবং বলে ওঠে,

সেকথা প্রকাশ পেলে ? তাহলে তো পাঁচ দিন কথা বন্ধ।

কল্যাণী আস্তে বলে, এইভাবে সংসার করিস তোরা ?

আমি একা কেন ? সবাই করে। বাঙ্গালোরে থাকতে আমার কলিগদেরও দেখেছি একই অবস্থা। শান্তি বজায় রাখতে—

কল্যাণী একটু হাসলো। শেষ পর্যন্ত সবসময় শান্তি বজায় থাকে না, এই যা।—

এই সময় তথাগত এলো।

সেও দেখছিলাম, দাদা সম্পর্কে যেন একটু বিশেষ স্নেহশীল হয়ে পড়েছে। সেও কী অনুভব করছে, তার দাদা নোঙরছেঁড়া নৌকোর মতো এখানে এসে ভিড়েছে একটু আশ্রয়ের আশায় !

কিন্তু হঠাৎ হাওয়াটা একটু ঘুরে গেল। কল্যাণীই ঘুরিয়ে বসলো। বলে উঠলো, এই তুই জানিস আমার ভোলামহেশ্বরের দুন স্কুল বোর্ডিংয়ের ঠিকানা ?

আমি ? স্বপ্ন দেখছ না কী ?

বোধহয় তাই। তবে দুঃস্বপ্ন। তোর দাদাও জানে না।

না জানাই স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক ?

তাছাড়া ? দাদার হঠাৎ মাত্রাটাত্রা একটু বেশী হয়ে গেলে, হয়তো ছেলেকে চিঠি লিখে কোথায় পাঠাতে কোথায় পাঠাবে !—

আচ্ছা। ও তোর দাদা নয় ? যা মুখে আসছে বলছিস ?

'যা মুখে আসাআসির' কিছু নেই। দিস ইজ ফ্যাক্ট। দাদা, তুই-ই বল, এখন আর তোর বোতলে শানায় ? না ড্রাম লাগে ?

বুদ্ধ রেগে উঠে বলে, সত্যিই তোর মুখ খুব খারাপ হয়ে গেছে তথা। এইতো এসেছি এখানে। তাই দেখছিস ?

আহা, সে হয়তো একটু রয়েসয়ে আছিস। তবে সত্যি বল, ওই শ্রীলঙ্কায় গিয়ে তোর সবদিকেই উন্নতি হয়েছে কিনা ? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 'বেদম' হয়ে যাস কিনা ? তাসে হেরে ঘড়ি-আংটি পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে আসিস কিনা ?

বুদ্ধ টেবিলে একটা ঘুষি মেরে খেঁকিয়ে বলে ওঠে, বানিয়ে বানিয়ে এইসব বলেছে বুঝি ও ? তোর সঙ্গে তাহলে খুব দোস্তি !

আমার সঙ্গে বৌদির দেখাই হয়নি। ওনার তো বারণ। আগেই সার্কুলার জারি করা হয়েছিলো এ বাড়ির কারো সঙ্গে তিনি দেখা করতে অনিচ্ছুক!

দেখা করিসনি এই কথা বিশ্বাস করবো আমি?

বুদ্ধ আরো রেগে ওঠে, তাহলে তুই এতোসব জানলি কি করে?

জানিনি তো। অনুমান করছিলাম। তাই—'লাগে তাক, না লাগে তুক।' ভেবে বলে ফেলেছি। দেখছি অনুমানটা ভুল নয়।

দেখো হে ছোটবাবু, বেকার অবস্থায় বাপের হোটেলে থেকে ঘুরে বেড়াবার সময় অমন মহাপুরুষ গিরি করা যায়।—সেরকম পরিবেশে পড়লে বুঝতে! এই শালার জীবনে আছেটা কী? অ্যাঁ? 'বাড়ি' মানে জেলখানা, সেখানে প্রতিক্ষণ একজনের নির্দেশে ওঠাবসা করতে হবে—আমারগরম হলে আমি একটু গা খুলে বারান্দায় বসতে পারবো না। ইচ্ছে হলে আমি—

তথাগত বাধা দিয়ে বলে, গা খুলেই বা বসবে কেন? সেটা সভ্যতা?

থাম, তোকে আর জ্ঞান দিতে আসতে হবে না। সাউথ ইণ্ডিয়ায় থাকতে হলে বুঝতিস গরমে কী কষ্ট!

তথাগত মুচকি হেসে বলে, আচ্ছা দাদা, গরম তো আর মেয়ে-পুরুষ বাছে না? মেয়েদেরও একই কষ্ট। তো তারাও যদি এমন ইচ্ছে প্রকাশ করে বসে?

বুদ্ধ রেগে ওঠে। ওর কপালের শির ফুলে ওঠে। আসলে এখন সে বেশ একটু ভারী অবস্থাতেই রয়েছে। চেঁচিয়ে উঠে বলে, বাজে তর্ক করিস না। পুরুষ আর মেয়ে এক হলো? তাছাড়া আমি মোটা মানুষ, আমার গরম একটু বেশী। তো এই 'মোটা'র জন্যই কী রকম লাঞ্ছনা, কম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ? খাবার হাতে নিলেন 'টণ্ট' করে কথা। ভদ্রসমাজের উপযুক্ত থাকতে হলে আমার নাকি ডায়েট কণ্ট্রোল করা উচিত। রেগুলার ব্যায়াম করা উচিত। কেন? কী চোরদায়ে ধরা পড়েছি? পয়সা থাকতেও ইচ্ছামতো খেতে পাবো না মোটা হবার ভয়ে? জগতে মোটা মানুষ থাকে না? সেটা না কী গাঁইয়ামি।—আমার সবকিছুই তিস্তা দেবীর কাছে গাঁইয়ামি।—

নিজে কোন বিলেত থেকে এসেছেন, অ্যাঁ?—একদিন সেকথা বলে ফেলায়, সাত দিন নন-কোঅপারেশন। বুঝতে পারছিস অবস্থা?

বুঝছি কিছুটা তাই তোমায় জ্বালানিবারণী সালসা খেয়ে খেয়ে লিভারের বারোটা বাজবার ব্যবস্থা করতে হয়।

বুদ্ধ আবার রেগে উঠে পড়ে। ওঃ, সবাই আমার ওপর ছড়ি ঘোরাতে আসবেন। ঠিক আছে। আমি ডিসিসান নিয়ে ফেলেছি।

আমি তো প্রমাদ গুনি।

কী আবার ডিসিসান রে বাবা। তাড়াতাড়ি বলি, ওর কথা আবার তুই গণ্য করছিস? সবাইকে ক্ষেপিয়ে দেওয়াই তো শ্রেষ্ঠ আমোদ। দেখিন না মাকেই সারাক্ষণ—

বুদ্ধ গুম হয়ে গিয়ে বলে. যাক, আর বোঝাতে আতে হবে না। যা বোঝবার বুছে নিয়েছি। দেখছি এ পৃথিবীতে আমার জন্যে সত্যিকার স্নেহ-ভালবাসা সহানুভূতি কারুর নেই। নিজের মা, তাও ভাবে বৌ যে ওনার ছেলেকে তালাক দিতে চাইছে, তার জন্যে ছেলেই দায়ী। সেই ব্যাটাই আসল ক্রিমিন্যাল।

কল্যাণী ঈষৎ কঠোরভাবেই বলে, বলেছি আমি তোকে এ কথা?

মুখে কী আর বলেছ? ভাবেই বোঝা যায়। হবে না কেন? 'স্বজাতি' যে। ওই যে—আর একখানি বৌ। তিনিও তো উঠে-পড়ে লেগেছেন সাহায্য করতে। কারণ যতো দোষ নন্দ ঘোষ না কী, সে হচ্ছে এই ব্যাটা বি চৌধুরী। মেয়েরা সবাই স্বর্গের দেবী! শালা বি চৌধুরী যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু হেসে কথা কয় তো 'হয়ে' গেল। সে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ। আর মিসেস চৌধুরী? তিনি পেটকাটা জামা পরে নেটের শাড়ির আঁচল উড়িয়ে আমার যতো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হি হি করে গড়িয়ে পড়বেন, তাতে দোষ নেই। বলতে যাও? তক্ষুণি ঘুমের বড়ি যোগাড় করতে বসবে।—এর নাম সুখের জীবন! লোকে আমার সুখ দেখে হিংসে করে! 'দাসত্ব' দিয়ে সুখ কেনা। ক্রীতদাস স্রেফ ক্রীতদাস।

উঠে চলে যায়। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শব্দ করে। —তবুও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, ভেবেছিলাম ডিভোর্স দিতে রাজী হবে না। অ্যাপলজি-টজি চেয়ে মিটিয়ে নেবো।—সে গুড়ে

কলকাতা আর জলপাইগুড়ি—এই দু-জায়গায় ওর বাবার নানাবিধ ব্যবসা ছিলো। জলপাইগুড়িটা বেশীর ভাগ দেখতো তিস্তার দাদা। কী রমরমা! কোথায় গেল সে সব? যদিও তখন আমার মেজছেলে বলতো, 'ওসব হচ্ছে কালো টাকার কারবার'।—কিন্তু তবু কালোরা তো আর বিদায় নেয়নি!

বাবলি বলেছিলো, বাপের বাড়িতে আর কেউ নেই তেমন তিস্তাদির।

কী জানি কী হলো! বাবা-মা মারা যাওয়া মাত্রই কী দাদা-বৌদি আর ওকে চিনতে চাইছে না?

তো তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাটা ব্যথা কেবল সেই আমাদের ভোলামহেশ্বরটিকে নিয়ে।

নিজেদের যদি এমন জায়গাতেই থাকতে হয়, যেখানে ছেলের পড়াশুনোর অসুবিধে। অথবা যেখানে বেশীদিন থাকার নিশ্চয়তা নেই, ছেলেটাকে দূর-দূরান্তরে একটা বোর্ডিংয়ে না রেখে কলকাতায় আমাদের কাছে রেখে দেওয়া চলতো না? কলকাতায় পড়াশুনো হয় না?

তা এ প্রশ্ন একদিন (অবশ্য স্বগতোক্তিতেই) করে ফেলায় কল্যাণীই আমার আহাম্মুকিতে হেসে উঠেছিল। বলেছিলো, বাবা-মায়ের সংসারটায় ঠিক থাকতেও ভাগ্যবন্ত ঘরের ছেলেপিলেরা দার্জিলিংয়ে গিয়ে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ছে না? দেরাদুনে গিয়ে পড়ছে না?—ওটা হলো আভিজাত্যের স্ট্যাণ্ডার্ড। 'মন কেমন'? সেটা আবার একটা জিনিস নাকি? সভ্যসমাজে ওকথা উচ্চারণ করতে আছে?—আর মা-বাপ বিদেশে বলে ঠাকুমা-ঠাকুর্দার কাছে ছেলে রেখে মানুষ করা? নাঃ। তোমায় এবার পিঁজরেপোলে পাঠানো উচিত! তুমি এ যুগের ধারেকাছে থাকবারও যোগ্য নয়।

কল্যাণীর ঠাট্টাটাট্টা বরাবরই এইরকম কড়া। তবু ছেলেটার একটু খবরের জন্যে বড় উৎকণ্ঠ হয়ে থাকি। কিন্তু দেবে কে সে খবর?

আমার বড়ছেলে তো মা-বাপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার দায়-দায়িত্বটি সম্পূর্ণই ন্যস্ত করে রেখেছিলো তার বৌয়ের ওপর। নিজে কোনোদিন খোঁজও নেয়নি, তবে ভারপ্রাপ্ত অফিসার কোনোদিন নিয়মের

ব্যতিক্রম করেনি। তার স্বামী মহোদয় কাজের খাতিরে যখন যেখানেই থাকুন, তিস্তা চৌধুরী ঠিক নিয়মিত মাসে দু'খানা করে পোস্টকার্ড ড্রপ করেছেন, এই নরনারায়ণ চৌধুরীর ঠিকানায়, কল্যাণী চৌধুরীর নামে।

যদি সেই চিঠিগুলো জমানো থাকে তো, দেখা যাবে কেবলমাত্র 'তারিখটা' ছাড়া আর কোনোখানে তফাৎ নেই।

টানাটানা সুছাঁদের অক্ষরে লেখা সেই চিঠিগুলো প্রায় একই, চিঠির জেরক্স কপির মতোই 'শ্রীচরণ কমলেষু মা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আমরা একরকম। আপনার 'ভোলামহেশ্বরটি' দিনদিন বেদম দুষ্টু হয়ে উঠছে। ওখানে এখন আবহাওয়া কেমন? এখানে তো প্রায় সবসময়ই গরম। আপনারা উভয়ে আমার প্রণাম জানবেন। ছোটবাবুকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।

ইতি 'তিস্তা'

এই চিঠি।

কদাচ হয়তো ওই 'আবহাওয়ার' জায়গায় 'বর্ষা' অথবা 'শীতের' উল্লেখ।…অনেকগুলো দিন এই একই ছন্দে একই তালে কেটে চলেছিলো। বুদ্ধধর ওই শ্রীলংকায় গিয়ে পড়ার পরই হঠাৎ তালভঙ্গ হলো। ছন্দভঙ্গ হয়ে গেল। অনেক স্ট্যাম্পমারা একটা খামের চিঠিতে পৌঁছুনো খবর দেওয়ার পরই, তিস্তা যেন কোথায় হারিয়ে গেলো।

মাঝে মাঝে বাবলি বলেছে, 'তিস্তাদির একটা চিঠি এসেছে।'

'এসেছে' মানে তার কাছে এসেছে। সভ্যসমাজে তো বলে ওঠা যায় না, 'কী লিখেছে?' বড়জোর বলা যায়, ভালো আছে তো ওরা?

তা কী আর করা যাবে! সুতো কেটে ভেসে যাওয়া ঘুড়িটাকে কি লাটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার হাতে এনে ফেলা যায়?

কিন্তু ভয়ানক একটা আশ্চর্য কাণ্ডই ঘটে বসলো হঠাৎ। অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। সেই কাটা ঘুড়িটাই হাওয়ায় উড়ে এসে সামনে এসে পড়লো। খুবই ঝোড়ো হাওয়ায় তা বোঝা যাচ্ছে ওর ঝোড়ো কাকের মতো মূর্তিটা দেখে। বলে উঠলাম, বুদ্ধ! তুই!

সত্যি বলতে, নিজেই বুঝতে পারলাম বিস্ময়টা বড় বেশী প্রকাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কী করবো? আমি কী কোনোদিন স্বপ্নেও

ভেবেছি, আমার বড়ছেলে তার বিপর্যস্ত মন নিয়ে মা-বাপের কাছে চলে এসে মানসিক আশ্রয় খুঁজবে ?

অথচ তাই এসেছে, আবার আগের মতো যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ছে, সকালে দাড়ি না কামিয়েই সকলের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ মায়ের রান্নাঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেন বিয়ের আগের বুদ্ধ। বিয়ের আগে না বলে বলা ঠিক প্রেমে পড়ার আগে। হঠাৎ ওই তিস্তা নামের মেয়েটার প্রেমে পড়ে, আর তার বাবার 'উচ্চাশা' দেখানোর হাতছানিতে ছেলেটা যেন এ সংসারবৃক্ষ থেকে পাকা ফলের মতো, অথবা শুকনো পাতার মতো খসে পড়েছিলো।

এখনও সেই শুকনো পাতার মতোই ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে।

আমরা নিজে থেকে ওর সম্বন্ধে ওকে কোনো প্রশ্ন করছি না। ছুটিতে এসেছে, না চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে, (সে আশঙ্কাও হচ্ছিলো এক একবার) তা জানি না। তাছাড়া, তিস্তা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও না। ভাবটা যেন, ছুটিতে এলে তিস্তা যেমন ওর বাপের বাড়িতে থাকে, যেন তেমনিই আছে।

আবার আমার মেজছেলে সম্পর্কেও কোনো কথা তোলা যাচ্ছে না। খুব সন্তর্পণে কথাবার্তা চালানো হচ্ছে। আসরটা কিছু জমিয়ে রাখছে তথাগত 'শ্রীলঙ্কার' বর্তমান উত্তাল পরিস্থিতি, আর সেখানকার এবং এখানকার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা তুলে, তর্ক তুলে।

তবু একদিন সেই অধরা অছোঁওয়া প্রসঙ্গটি এসে পড়লো। পড়ল অবশ্য সেই আমাদের ভোলামহেশ্বরের প্রসঙ্গে!

আমিই বলে বসলাম, ভোলামহেশ্বরকে ওই দূরে জায়গায় চোখছাড়া করে বোর্ডিংয়ে রাখার কী দরকার রে বুদ্ধ ? এই কলকাতা শহরে পড়া হয় না একটা বাচ্চা ছেলের ?

বুদ্ধ হঠাৎ চড়ে উঠে বললো, সে কথা আমায় বলে লাভ ? যার ছেলে তার মাথা থেকেই বেরিয়েছে এটি।

কল্যাণী প্রায় ধমকের সুরে বললো, 'যার ছেলে' মানে ? তোর ছেলে নয় ?

আইনত হয়তো, তবে কার্যত নয়। ছেলে সম্পর্কে তার মায়ের রায়ই শেষ রায়। আমি তো বলেছিলাম, 'কলকাতায় রাখা যায় না ?'

—বললো, 'অ্যাবসার্ড' কথা বোলো না।' তো ওর মা-বাবা দুজনেই যে আবার পটল তুলে বসলেন। সবদিকেই অসুবিধে হয়ে গেল।

আমার বড়ছেলের কথা শুনে মনে হলো, যদি তিস্তার মা-বাপ কলকাতায় থাকতেন, হয়তো ব্যবস্থা অন্যরকম হতো।

পালার বদল ঘটে চলেছে। আজকের মেয়েরা বিয়ে হয়ে গেলেও, স্বামীর ঘর বা স্বামীর আত্মীয়জনকে আপন ঘর আপন আত্মীয় ভাবতে পারে না। পুরনো অভ্যাসে নিজের মা-বাপকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সেখানেই আস্থা। সেখানেই বিশ্বাস।—দেখি তো এদিক ওদিক। এই তো আমাদেরই সামনের বাড়ির ছেলেমানুষ বৌটি! যখনি সিনেমা-টিনেমা যায় বা বেরোয়, শিশুশাবকটিকে ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে বেলতলায় না কোথায় নিজের মায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে দিয়ে যায়। ফেরার সময় আবার নিয়ে আসে। তা রাত হয়ে গেলেও ঘুমন্ত ছেলেটাকে টানতে টানতে আনতে হয়। কারণ হলেও বছর আড়াই-তিনের ছেলেটা, ভোর সকালে তো তার ইস্কুল আছে। অথচ ওই বৌটির বাড়িতে একবাড়ি লোক। শ্বশুর-শাশুড়ী, আইবুড়ো একটা ননদ, এবং বড়জা, ভাসুর।

কিন্তু বৌটির বর?

সে তো মাটির গণেশ! তার নিজের কী কোনো ভয়েস আছে?—'কর্ত্রীর ইচ্ছেয় কর্ম'।

আমার বড়ছেলের বাড়িতেও সেই একই ব্যাপার। তবু কল্যাণী বললো, তো ছেলেটার ঠিকানাটুকু পর্যন্ত জানতে পারিনি আমি যে শখ করে একটু চিঠি দেবো। দে তো ঠিকানাটা!

বুদ্ধ আকাশ থেকে পড়লো।

ঠিকানা? পাপ্পার ঠিকানা? আমি কী করে জানবো? চিঠি লেখালেখি করে ব্যবস্থা, ভর্তি করে আসা সবই তো ওর মা-ই করেছে!

কল্যাণী বসে পড়ে বলে, সবকিছু মা করেছে বলে তুই তোর ছেলের ঠিকানা জানিস না?

আমি! বাঃ! দরকার তো হয়নি! মানে—

থাক। তোর আর 'মানে' বোঝাতে হবে না। বলি ছেলেকে

বলি হে তিস্তা চৌধুরী। এই বি. চৌধুরী আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে।—তিনি ক্রমশ বুঝুন কত ধানে কত চাল। মহারানীর মতন আছেন, যথেচ্ছ স্বাধীনতা, তবু পোষাচ্ছে না। কী? না চৌধুরী কেন 'কাজ কাজ' করে এতো মত্ত? কেন দেরী করে অফিস থেকে ফেরে?—সে তার কেরিয়ার দেখবে না। বাড়ি বসে কাব্যি করবে!

ক্রমশ কথা জড়িয়ে আসে, আর বোঝা যায় না কী বলছে।

কল্যাণী ছোটছেলের দিকে তাকিয়ে বললো, দিলি তো ক্ষেপিয়ে? তোর যে কী এই এক রোগ! বেশ ছিলো ক'দিন!

তথাগত একটু হেসে বলে, আমি তো 'নিমিত্তমাত্র' মা। এ যেন মহাভারতের গল্প। যা হবার তা হয়েই আছে? কদিন ভালো থাকত মা? যে বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কী আর বেশীদিন দুধভাতে খুশী থাকে?

আমি বুদ্ধর সম্পর্কে খুব একটা আশা পোষণ করছিলাম না। তবু মনে হচ্ছিলো যে কটা দিন মা-বাপের কাছে শান্তিতে থাকে থাকুক।—কিন্তু আমার ছোটছেলের কথাই ঠিক। মা-বাপের স্নেহ-সহানুভূতি, এ হচ্ছে দুধভাত মাত্র। বয়স্ক সন্তানের কাছে তার আকর্ষণ কতখানি?

বুদ্ধর সেই স্খলিত জড়িত স্বরটি আর শোনা যাচ্ছে না। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রে খাবার সময় কল্যাণী একটু ডাকাডাকির চেষ্টা করে বিফল হয়, নিজেরা সেরে নিয়ে শুতে যাচ্ছি, নীলোৎপল ডাক্তারের বিশু এসে দাঁড়ালো।

কী? কী হয়েছে?

ডাক্তারবাবুর তবিয়তটা খারাপ লাগছে—

চমকে উঠলাম। কী হয়েছে?

অন্য কিছু হচ্ছে না। ওই যা হয়। বুকে কষ্ট। তো আমি বলে গেছি জানাবেন না। আমায় মানা করে দিয়েছিলো।

চলে গেল তাড়াতাড়ি।

সেই যেদিন আমার ছেলেকে 'ভাগ্নে' গণ্য করে তার নামে বাড়ি লিখে দেবার প্রস্তাব করে ফেলে বোকা বনে গিয়েছিলো ডাক্তার, সেদিন থেকে একটু বেশী চুপচাপ হয়ে গেছে। এদিকে আমাদেরও বড়-ছেলের জীবনের গোলমেলে ব্যাপারে আগের মতো সন্ধ্যায় আড্ডা দেওয়ার সময়ও হচ্ছে না। লোকটার যে তলে তলে শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে, আর তেমন খেয়াল করিনি।

বললাম, কল্যাণী, চলো দেখিগে কী হয়েছে!

ও বললো, দুজনে একসঙ্গে গেলে বিশুকে সন্দেহ করবে। তুমি যাও, আমি একটু পরে, তোমায় ডাকতে গেছি বলে যাবো।

কিন্তু কল্যাণীর মুখটা দেখে মনে হলো, এখনি ছুটে যেতে যাবার জন্যে ব্যাকুল। বললাম, সেটা উল্টোও করা যায়। তুমিই আগে যাও—

ও বললো, না না। তুমি চলে যাও, যেন একটু খোঁজ নিতে গেছো এই ভাবে। তারপর একটু হাসির মতো করে বললো, আমি আমার ভালোবাসার লোকের কাছে একটু বসতে গেছি, আর তুমি তক্ষুণি আমার খোঁজ নিতে ছুটলে, এটা দেখলে লোকটা তোমায় হিংসুটে ভাববে।

আমিও হাসলাম।

এখন ওসব 'ভাবাভাবি'র কাল আছে?

কী বলা যায়? ও আবার যা অভিমানী! দেখলে না সেই বাড়ির কথার পর থেকে কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। যাও, যাও। ওই বুড়ো বিশুটা কী বুঝতে কী বুঝছে জানি না। তেমন কিছু হলে বারণ করবে কেন?

কল্যাণী অনেক সময়ই নীলোৎপলের সম্পর্কে আমার কাছে উল্লেখ করতে অনায়াসে 'আমার ভালোবাসার লোক', 'আমার ফ্যান', 'আমার গুণমুগ্ধ ভক্ত', 'আমার নীরব প্রেমিক' অবলীলায় বলে।—মনে হতে পারে সবটাই কৌতুক। কিন্তু কল্যাণীর মনের মধ্যে লোকটার জন্যে অনেকখানি জায়গা রিজার্ভ আছে, তাও আমার অবিদিত নয়। কিন্তু তা তো কই কখনো কোনো অসুবিধে অনুভব করিনি।—কখনো সুখের অভাব ঘটেনি। জানি কল্যাণী ওই ডাক্তারের নীরব ভালো-

বাসাটিকে 'শ্রদ্ধা' করে মমতা, ' করে।

আমার বড়ছেলে বলেছিলো, 'ক্রীতদাসত্বের বদলে 'সুখ' কেনা। কিন্তু সেটাই কী একমাত্র কথা? শেষ কথা?—'সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমঝোতা, এগুলোকে কী কাজে লাগানো যায় না? কাজে লাগানো যায় না কিঞ্চিৎ উদারতাকে? হৃদয়ের পরিধিটা কি একটু বাড়ানো খুবই অসম্ভব?

'মানুষ' জাতটার কী কখনো কেবলমাত্র 'প্রাণীজগতের' থেকে উত্তরণ ঘটবে না?—মানুষ অতি অনায়াসে মানুষের মাথায় লাঠি বসিয়ে দিতে পারে, অথচ একটু উদার হতে পারে না।

আমার মেজছেলে মেজবৌ একদিন এলো। না, বুদ্ধ এখানে থাকতে নয়। বুদ্ধ চৌধুরী তিস্তা চৌধুরীর অধ্যায় সমাপ্ত হয়ে যাবার পর। বুদ্ধ শ্রীলঙ্কায় চলে যাবার পর। ওর চাকরির কণ্ট্রাক্টের তিন বছরের মেয়াদটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি মেয়াদ বাড়িয়ে আরো পাঁচ বছর করে দিয়েছে। ও ওর মেজভাইকে নাকি জানিয়ে গেছে, আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে।—না, এবার আর বাঙালি মেয়ে নয়। বাঙালি মেয়েদের নাকি সর্বগ্রাসী চাহিদা! ও দেখেছে তার থেকে অনেক ভালো সিংহলী মেয়েরা। আর সে মেয়ে ওর কাছে দুষ্প্রাপ্য নয়।—কারণ রোজগারটাও তো ওর ফ্যাল্‌না নয়।

আর তিস্তা চৌধুরী? সে নাকি এখন আবার কুমারী পদবীতে ফিরে গিয়ে লাহিড়ী হয়েছে।—সে এখন আর এক নতুন মামলা ঠুকেছে তার দাদা সীতেশ লাহিড়ীর নামে। বাপের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে—চুলচেরা ভাগ আদায় করতে।

বাবলি আদুরে আদুরে আর করুণ গলায় বললো, বাবাঃ! একটা মিটতে না মিটতেই আর একটা। পারছেও বাবা তিস্তাদি।—আর ওই উকিল-টুকিলরাও বড় ডেঞ্জারাস লোক হয় বাবা। প্ররোচনা দিতে ওস্তাদ।—আমি বাবা বলে দিয়েছি, আমাদের সঙ্গে যখন সম্পর্ক-টম্পর্ক আর রইলো না, তখন আর কেন আমার বাড়ি থেকে কেবলই

কোর্ট ঘর করা ?—তো এখন কোন একটা বন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে যাই বলুন, বাড়ির মধ্যে সর্বদা একজন বাইরের লোক থাকা খু অসুবিধে। কী বলুন মা ? তাই না ?

অতঃপর কী কী অসুবিধে তার ফিরিস্তিও খুলে বসেছিলে কিছুটা। তবে এসব ক্ষেত্রে অপর পক্ষের তেমন উৎসাহ না দেখলে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়।

আসলে যে ওরা ওদের এতোদিনের জ্বালা, ঝামেলা এবং নিজেদে 'কর্তব্যপালনের মহত্ত্ব' ওইগুলোই জানাতে বোঝাতে এসেছিলো ত তো বোঝাই গেল। তবে আসার উপলক্ষটা দেখিয়েছিলো নীলোৎপল ডাক্তারের খবরটা।—এতে ওদের বোধহয় একটু সুবিধেই হয়ে গেল এতোদিনের অনুপস্থিতির, বলতে গেলে আমাদের সঙ্গে প্রা যোগাযোগশূন্য হয়ে থাকার লজ্জা অস্বস্তিটা কেটে গেল। এসেই তো বললো, 'কাগজে দেখলুম! কী খারাপ যে লাগলো!—উনি যে এতো পরোপকারী সমাজসেবী গরীবদরদী ছিলেন, তাও ছাই এতে ভাল করে জানতুমও না। কাগজে দেখলুম সে-সব। চাপা স্বভাবে ছিলেন তো!'

এসবই অবশ্য বাবলির উক্তি।

প্রভু শুধু বলেছিলো, ছেলেবেলায় আমাদের খুব ইয়ে করতো সব সময় প্যান্টের পকেটে চকোলেট মজুত।

হ্যাঁ, প্রথমটায় এইভাবেই ওরা বেশ ম্যানেজ করে নিয়েছিলো।

ওরা চলে যাবায় পর আমার ছোটছেলে হঠাৎ বলে বসলো, মেজদা মেজবৌদির কখনো ডিভোর্স হবে বলে মনে হয় না।

শুনে চমকে গেলাম। এ আবার কী কথা! এদের কী কোনো কথাই মুখে বাধে না!—ভাবলাম কল্যাণী হয়তো একটু বকে উঠবে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হলো না শুনতে পেয়েছে কথাটা। অথচ ওদে যত্ন করে খাওয়ানোয় কোনো ত্রুটি দেখলাম না। তবে সবই চুপচাপ!

আমিই বললাম, আবার এসব খারাপ কথা কেন ?

তথাগত হেসে হেসে বললো, দেখছি তো—মেজদার তো আলাদা কোন সত্তাই নেই। আর ও এতো কিপটে যে পয়সা হলেও কখনো নিজের পয়সায় মদটদ খাবে না! কাজেই বিয়েটা টিকে যাবে।

এইরকমই ঠাট্টা তথাগতের। মনে হয় 'ব্যঙ্গ'! তা কিন্তু নয়।

তবে 'সেদিন' ওকে একদম অন্যরকম দেখেছিলাম। খুব সিরিয়াস, খুব ম্রিয়মাণ। যেন বা বেশ একটু আহত। ডাক্তার যে অমন আচমকা চলে যাবে ভাবেনি নিশ্চয়। শুধু বললো, আমায় খুব ভুল বুঝে গেলেন। ভাবিনি হঠাৎ এরকম—

আমিই কী ভেবেছিলাম?

ভেবেছিলাম এমন কিছু না।

আমার সঙ্গে তো কতো কথাও কয়েছিলো। হঠাৎ কখনো যা না করে তাই করে, অর্থাৎ আমার হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলেছিলো, আচ্ছা জামাইবাবু, আপনার কখনো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে না? যেখানে সেই ছেলেবেলাটা কেটেছে, সেখানে যেতে ইচ্ছে করে না?

শুনে আমি মনে মনে হেসেছিলাম। ছেলেবেলার কথা? মনে আবার পড়ে না? এখন তো আবার বেশী বেশীই মনে পড়ছে। অহরহই তো সেই জায়গাগুলো চোখে ভেসে ভেসে উঠছে!

তো মুখে বললাম, মনে অবশ্যই পড়ে! তবে যেতে ইচ্ছে করে কিনা এটা ভেবে দেখিনি।

ও বললো, আমি কিন্তু আজকাল প্রায়ই ভাবি। মনে হয় যেন আজিমগঞ্জে আমাদের সেই বাড়িটায় একটা হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।—ফড়িং ধরবো বলে বাগানে ছোটাছুটি করে মার কাছে বকুনি খাচ্ছি।—বাবাকে দেখতে পাই—ধুতির ওপর কোটপরা গলায় 'স্টেথস্কোপ' ঝোলানো। ভারী ভারী মুখ, মোটা গোঁফ। বারবার যাচ্ছেন আসছেন। কখনো মাকে ডেকে বলছেন, 'আবারও এখন ছুটতে হবে, দেরী হলে তোমরা খেয়ে নিও।'—মা অবশ্য কোনোদিনই খেয়ে নিতেন না, তবু বলেও যেতেন রোজই।—বাবা চলে গেলে, মা বলতেন, বেশীর ভাগ রুগীই তো ব্যাগারের। তবু ছুটোছুটির তো কমতি দেখি না। আবার দেখ্ না, হয়তো এসে হুকুম হবে—নবীনের বাড়িতে খুব খানিকটা বার্লি বানিয়ে পাঠিয়ে দাও তো মোক্ষকে দিয়ে। এমন সব অভাগা—বার্লি রাঁধতেও জানে না।···নবীনের মা-টা বলে কিনা, সেটার রান্নাটা কেমন করে করতে

হবে ডাক্তারবাবা ?

বলতেন আর হেসে উঠতেন। বুঝলেন জামাইবাবু, হঠাৎ হঠাৎ যেন বাবার সেই হাসির আওয়াজটা শুনতে পাই। মনে হয় সেখানে গেলে, বুঝি দেখতে পাবো যেমন ছিলো সব তেমনি আছে।

এই সময় কল্যাণী এসে বসেছিলো।

নীলোৎপল ওর দিকে তাকিয়ে খুব ব্যগ্র-ভাবে বলেছিলো, আচ্ছা কল্যাণী, তুমি আমি জামাইবাবু একবার আজিমগঞ্জে বেড়াতে গেলে কেমন হয় ? চলো না যাই ? তোমারও তো ছেলেবেলার জায়গা ? আর জামাইবাবুরও—

কল্যাণী বললো, তা বলেছ ভালোই। গেলে মন্দ হয় না!

আচ্ছা কল্যাণী, তোমার কখনো খুব ইচ্ছে করে না ?

কল্যাণী বললো, কই ? খুব ইচ্ছে তো—কে-ই বা আছে সেখানে ?

নীলোৎপল ডাক্তার একটু ঝিমিয়ে পড়ে বলেছিলো, আমিও তাই ভাবতাম, 'কে-ই বা আছে সেখানে ?' আরে বাবা, 'সেইখানটা' তো রয়েছে ? তা একবারও ভাবিনি। এই যে দেশভাগের পর, যারা কী বলে ওই 'ছিন্নমূল' না কী যেন হয়ে চলে এসেছে, তাদের এখনো পর্যন্ত কী হাহাকার, 'আর সেখানে যেতে পেলাম না' বলে। আমার পেশেন্টদের মধ্যেও তো দেখি এরকম অনেককে। তাদের কথা শুনে মনে হয়, যেন কী এক স্বর্গের বাগান না কী এক ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলে চলে এসে বসে আছে। তাদের ছেলেবেলার সেইসব স্মৃতির জায়গাগুলো না কী তাদের হাজারটা হাত বাড়িয়ে টানে। অথচ আমরা ? আমাদের ছেলেবেলার জায়গাগুলো তো কেউ নিষিদ্ধ করে দেয়নি ? একবারও ইচ্ছে হয় না, যাই দেখে আসি। আসলে হারিয়ে না ফেললে তার মূল্য বুঝি না আমরা।

নীলোৎপল ডাক্তারকে আমি কখনো একসঙ্গে এতো কথা বলতে শুনিনি। ওর তো জ্বর হয়নি, অথচ যেন জ্বরের তাড়সে কথা বলার মতো বলে চলেছে।

কল্যাণীও সেটা বুঝতে পারে, আস্তে বলে, ডাক্তার সাহেব, শরীর ভালো নেই, এতো কথা কইতে হবে না। আচ্ছা তুমি একটু সেরে

ওঠো, যাওয়া যাবে তিনজনে মিলে—

ও বললো, বলছ ?

বলছি তো।

তাহলে বেশ হয়, বুঝলে ! কী ভালো যে হয় !

কল্যাণী হঠাৎ বলে উঠলো, আচ্ছা ডাক্তারমশাই, তোমার বৌকে মনে পড়ে না ?

কল্যাণী কি ওই 'হারিয়ে ফেলে তবে তার মূল্য বোঝা' শুনে কিছু ভাবলো ?

ডাক্তার কিন্তু যেন একটু অবাক হয়ে বললো, বৌ ? কোন বৌ ?

বাঃ। তোমার নিজের বৌ ! যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিলো।

ডাক্তার চোখটা বুজে আস্তে বললো, ও ! না, সেরকম, মানে—কদিন-ই বা দেখেছি ? বেশীটা তো বাপের বাড়িতেই থেকেছে। তাছাড়া—

থেমে গিয়ে আবার তখনই বলে উঠলো, 'মোক্ষ'কে খুব মনে পড়ে। আর বাবার সেই কম্পাউণ্ডার জগদীশবাবু।—আর সেই ছেলেটা, নাম মনে নেই, গাছ থেকে নারকেল পাড়তে আসতো। আর মাস্টার-মশাইদেরও কতজনের কথা মনে পড়ে। 'পড়ে' না, আজকাল পড়ছে। আশ্চর্য, কেউ কোনোদিন এলো না, অথচ আজ সব্বাই ভিড় করে একসঙ্গে—এমন কী সেই চাঁপাগাছটা ! মর্নিংস্কুলে যাবার সময়, যার তলা দিয়ে যেতে যেতে ফুল কুড়িয়ে পকেটে পুরে জামায় দাগ ধরাতাম। সবাই এসে ভিড় করছে কেন তাই ভাবছি।

এতো মনে আছে আপনার ?

আমি হেসেছিলাম, মর্নিং স্কুলের সময় এসব কর্ম তো আমরাও করেছি। আমার তো আবার ছেলেবেলায় বিরাট গুষ্ঠীর ব্যাপার ! মর্নিংস্কুলের সময়টা ছিলো ভারী আহ্লাদের। যদিও ভীষণ কড়া শাসন ছিলো আমাদের। সকল দুষ্কর্মই লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে হতো।

কল্যাণী হেসে উঠেছিলো, 'দুষ্কর্ম' আবার কে কবে দেখিয়ে দেখিয়ে করে ?—আচ্ছা, আজ ডাক্তারবাবু ঘুমোন। অনেক রাত জাগা হয়েছে। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা হোক। সুটকেস গুছিয়ে

'জয় মা কালী' বলে বেরিয়ে পড়া যাবে—সেই ফেলে আসা দিনের—জায়গায়।

নাঃ! সে কথা আর রেখে উঠতে পারেনি কল্যাণী!

সুটকেস আর গোছানো হয়নি।

কদিন যেন পরে কল্যাণী জেগে উঠলো, তবু যাই চলো, আমরা দুজনেই যাই। ও'র বাবা সেই নীলাম্বর ডাক্তার, যিনি আমায় প্রাণে এবং মানে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁর ভিটেবাড়িটা একবার দেখে প্রণাম করে আসি।

বললাম, সে কী আর এখনো আছে? কতো ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

ও বললো, থাকতেও পারে। মফস্বল জায়গায়, পাড়াগাঁ জায়গায় পরিবেশ সহজে বদলায় না। পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরেও একটা 'পোড়ো পোড়ো বাড়ি' একইভাবে পড়ে আছে, এমনও দেখা যায়।

নীলোৎপল ডাক্তার অনেকদিন আগেই ওয়ার্নিং বেল দিয়েছিলো। তবু আমরা যেন সেটায় তেমন গুরুত্ব দিইনি। আসলে যতোক্ষণ না হুড়মুড়িয়ে কিছু ঘাড়ে এসে পড়ে, একই ছন্দে দিনরাত্রি আবর্তিত হয়, ততোক্ষণ মনে করি এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এইভাবেই বোধহয় চিরকাল চলবে।

ভেবেছিলাম 'বিশু' নামের লোকটা বুঝি দেশে চলে যেতে চাইবে। বারণ করবে কে? অথচ চলে গেলে সেটা একটা সমস্যায় দাঁড়াবে। কে দেখবে এই বাড়ি?

কিন্তু আশ্চর্য, বিশু দেশে যাবার নামও করলো না। সে ঠিক নিত্য নিয়মে যথাসময় উঠে যথাকর্তব্য করে চলে।—গেট খোলে, পাম্প চালায়, গেটের কাছে যে কয়েকটা গাছ আছে, তাতে জল দেয়।—ডিসপেনসারি ঘর খুলে ঝাড়ামোছা করে। যেমন সবকিছু বুক দিয়ে আগলাতো, তেমনিই আগলায়।

ইদানীং নীলোৎপলের শরীর খারাপ হওয়ায় ওর সহকারী ছাড়াও আর একজন ডাক্তারকে বসেয়েছিলো, সে আসে। দাতব্যের রোগীদের দেখে।—চলে যায়। বিশ্ব আবার ঘর-দরজা মোছে।—ডাক্তারের শোবার ঘরটা দু-বেলা খোলে, ঝাড়ে, ঘরের মধ্যে খাটের সামনে একটা ধূপ জেবলে রাখে। এটা ডাক্তারেরই নিয়ম ছিলো। সন্ধ্যায় ঘরে থাকুক না থাকুক ধূপ জবালা।—বিশ্ব সে নিয়ম চালিয়ে যায়। শুধু সবই নিঃশব্দে। লোকটা যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে।

তবু ওকেই ডেকে বললাম আমাদের যাবার কথা। আমরা কটা দিন একটু ঘুরে আসি। বললাম, ছোটদাবাবু থাকবে, নিমাই থাকবে, তুমি তো আছোই।

ও মাথাটা হেলিয়ে বোঝালো ঠিক আছে।

আর তারপরই হঠাৎ ও ওর সেই পেটেণ্ট ভাঙা ভাঙা স্বরে, যে স্বরটা আজ কতোদিন শোনা যায়নি, বলে উঠলো, 'ডাগ্‌দারবাবুও তো রইছেন'!

'ডাগ্‌দারবাবুও তো রইছেন'।

'গায়ে কাঁটা দেওয়া' বলে একটা কথা বরাবর শুনে এসেছি, তার অনুভূতিটা কী এইরকম?

একটা বেহারি দেহাতি নিরক্ষর লোকের কণ্ঠস্বরে 'নিশ্চিত প্রত্যয়ের' কী সহজ প্রকাশ।—কল্যাণীর দিকে তাকাতে পারিনি, তবু টের পেলাম, আচমকা ওর চোখ দিয়ে জল উপচে পড়লো। এতোদিনের মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষে কোনোদিন কল্যাণীর চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখিনি।

নীলোৎপলের শৈশবের স্মৃতির ঘরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আমাদেরই কী হলো? কল্যাণীর! আমার!

ভাগ্যের বিড়ম্বনা, যেদিন যাবো তার আগের দিন আমার মেজদার সেজছেলে সেই বটাই? সে হঠাৎ এসে হাজির!

এলে তো দু-চার দিন থেকে যায়, পাছে সেই আশা করে বসে, তাই ওকে জানিয়েছিলাম, তুই আজ এলি! আর আমরা কালই

বেরিয়ে পড়ার ঠিক করেছি।

ও শুনে চমকে উঠে বললো, আজিমগঞ্জে? সেখানে তোমাদের কে আছে? খুড়ি, তোমার মা-বাপ আছে না কী?—

কেউ কোথাও নেই শুনে বটাই নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠে, তাহলে গিয়ে কোন চুলোয় উঠবে শুনি? কাকার সেই যে মামা না কে একজন ছিলো, সে তো কোন জন্মে পটল তুলেছে।— ইস্! গেলে পত্রপাঠ ফেরত আসতে হবে। কেন? কেন নয়? কাকার সেই জাঁহাবাজ মামীটিও তো হাঁপানিতে ভুগে ভুগে মরে শান্তি পেয়েছে। কিন্তু আরো একখানি জাঁহাবাজ আছে না। ওঃ! ডেঞ্জারাস্।

বুড়ো-বুড়ির তো ছেলেপেলে কিছু ছিলো না। তো বুড়ি একটা বিধবা ভাইঝিকে এনে পুষেছিলো। তো ভাইঝিটি পিসির ওপর আর এক কাঠি সরেস। কেউ ওর বাড়ির কানাচ দিয়ে হাঁটলে গাল দিয়ে ভূত ভাগায়, গোবরজল ছড়া দেয়। সেখানে গিয়ে উঠবে, এ দুরাশা ছাড়ো।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তুই এতো কথা জানলি কী করে?

আমি? হুঁঃ। এই বটাই চৌধুরী, একদা ইস্কুলের খাতায় যার নাম ছিলো ব্রজনারায়ণ চৌধুরী, তার আবার অজানা কী আছে? ওখানে আমার এক মাসির মেয়ের বাড়ি না? যাই না সময় অসময়ে মাঝে-মধ্যে? তো বোনাই বেশ খাতির করে। বলে, বাবা! আপনি কতো বড় বংশের ছেলে!

কিন্তু নীলাম্বর ডাক্তারের ভিটে?

নীলাম্বর ডাক্তার? ওখানের বুড়োরা যাকে 'পাগলা ডাক্তার' বলতো?—সে তো তোমাদের ওখেন থেকে অনেকটা দূরে—

কল্যাণী বললো, তা জানি। তো ভিটেটা তো আছে?

ক্ষ্যাপা না পাগল। তাই কখনো থাকে? তার তো কোনো ওয়ারিশান ছিলো না—

কেন থাকবে না? ছেলে ছিলো তো—বলে উঠলাম আমি।

বটাই দু-হাত উল্টে বললো, ছিলো না কী? কই সাতজন্মে তো কেউ যেতে দেখেনি। তো শুনেছি জ্ঞাতিদের কারচুপিতে সেই

বাগান পুকুর ভিটেবাড়ি সব মারোয়াড়ির হাতে চলে গেছে। এখন সেখানে তাদের চালকলের গোডাউন!—তো বলি বাপু, বেরোবার যখন ঠিক করেছ নাড়ুকাকা, নিজের পিতৃভিটেতেই একবার চলো না। কতোবার বলি। কী গো নাড়ুখুড়ি? জন্মজীবনে তো শ্বশুরের ভিটে দেখলে না, তো একবার নয় ভাঙা ইঁট কখানাই দেখবে চলো। তবু তো বটাই হতভাগার সংসারটা রয়েছে সেখানে, এক গেলাস জল তো জুটবে। একমুঠো রাঁধা ভাতও জুটবে। অবিশ্যি বটাইয়ের তো ভাঁড়ে মা ভবানী। নেহাত শাকভাতই জুটবে।

কল্যাণী একবার শুধু বলে উঠেছিলো, 'ডাক্তারের কাছে কথা দিয়েছিলাম। সেকথা না রেখে—'

আমি বললাম, তবে থাক! বটাইয়ের কথা বাদ দাও।

কল্যাণী কী ভেবে বললো, নাঃ। চলো। সত্যিই তো! শ্বশুরবাড়ির চেহারাটা তো দেখাওনি কখনো আমায়।

সত্যিই দেখাইনি। কেন সে চেষ্টা করিনি, তা জানি না। আসলে খেয়ালই হয়নি। নীলোৎপল ডাক্তার ঠিকই বলেছিলো, যারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের মধ্যে হাহাকারের সীমা নেই। অথচ যারা হারায়নি, যাদের বাধা নেই, বারণ নেই, তাদের কোনোদিন মনে হয় না, একখানা 'স্বর্গের বাগান' পড়ে আছে আমার।—তা যদি মনে হতো গ্রামগুলোর এমন দুরবস্থা ঘটতো না। আর শহরেও এমন নারকীয় ভিড় এসে জমতো না।—

শুধু একটিবার দেখতে যাওয়ার অভাবে কতো লোকের 'দেশের বাড়ি' জমিজমা হাতছাড়া হয়ে গেছে, তার হিসেব নেই। তা তাদের অবশ্য দুঃখও ছিলো না তাতে। তবে এখন তাদের সন্ততিকুল দেখছে, 'অজ' পাড়াগাঁয়েও এখন জমির দর আকাশ ছুঁতে চাইছে। কিন্তু চাইলে কী হবে? বাপ কাকা কি তার কাগজপত্র দলিল-টলিল রেখে দিয়ে গেছে যত্ন করে? অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছে।

ওই সন্ততিরা এখন পরলোকগতদের 'মুখ্যুমি' নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে, হাত কামড়ায়।

এমন ইতিহাস ভুরি ভুরি।

তা জঙ্গীপুরের এই নারায়ণগুষ্ঠীই তো তার সাক্ষী।

সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত জগৎনারায়ণ চৌধুরীর বংশধরদিগের অনেকেই তো রয়েছেন এখনো এদিক ওদিক। কিন্তু কে সেই ভিটেয় পা ফেলতে যাচ্ছে?

এই নরনারায়ণ না হয় কৈশোর থেকেই আত্মনির্বাসিত, কিন্তু আর সবাই?—বড়জ্যাঠার আর মেজজ্যাঠার মিলিয়ে পুত্র-পৌত্রাদি তো নেহাত কম নয়। সবাই না থাকুক, কেউ কেউ তো আছে। অন্তত শাখা-প্রশাখারও। কিন্তু কবে কার পা পড়েছে এখানে? বটাই নেহাত লক্ষ্মীছাড়া হাভাতে বলেই—

ভাঙাচোরা কাদাখোঁচা একটা ভাঙা রোয়াকের সিঁড়িতে বসে পড়ে কল্যাণী বলে, এই এতো স-ব তোমাদের?

বটাই তার নাড়ুখুড়িকে চৌধুরীবাড়ির সীমানা চেনাতে অনেকক্ষণ থেকে মহোৎসাহে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। এবং যথাসম্ভব পরিচিতি দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ ওর যতোটুকু জানা।

কল্যাণী ওই ঝোপজঙ্গল বাগান পুকুর বৈঠকখানা বাড়ি সব ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় বসে পড়ে বলে ওঠে, এই এতো স-ব তোমাদের?

বটাই নিজস্ব গ্রাম্য ভঙ্গিতে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠে উত্তর দেয়, 'তোমাদের' কী গো? বলো 'আমাদের'? এই হচ্ছে চৌধুরীদের এখন যা যতটুকু আছে। কে কোনদিক কোনদিক থেকে বেআইনি হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে কতোটা কী গ্রাস করেছে খোদা জানে। আম-বাগানগুলো তো জমা ধরানো থাকতে থাকতে মনে হয় অপরেরই। তারা দয়াছেন্দা করে কাঁচা আমের সময় 'কিছু', আর পাকা আমের সময় কিছু মূল মালিকের বাড়ি উপহার দিয়ে যায়, সেইটুকুই পাওনা।

কল্যাণী শ্রান্তভাবে বলে, তবুও তো অনেক।

তা যা বলেছ খুড়ি। 'কথায় বলে মরা হাতী লাখ টাকা'। ওই মজে যাওয়া পুকুর দুটো, খিড়কির আর বারবাড়ির? ওদের এখন সংস্কার করিয়ে মাছের ডিমপোনা ফেলে, মাছের ব্যবস্থা করলে কতো আয় হয়!—চারামাছ বেচেও লাভ আছে। কিন্তু করছে কে? সে যা করে গেছে সেই আমাদের প্র-ঠাকুর্দা বুড়ো। তারপর আর কেউ আঙুলটি নেড়েছে?—যে পাখি যেমনে পেরেছে পুরনো বটের বাসা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে অন্য গাছ খুঁজে বাসা বেঁধেছে।

আমি দূরে দাঁড়িয়ে এই বৈঠকখানা বাড়ির ভাঙা নড়বড়ে দরজা-জানালাগুলোর রংজ্বলা ফাটাচটা কপাটগুলোয় চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কিছু একটা খুঁজে ফিরছিলাম। ওদের কথা শুনে বললাম, তা তুই-ই বা বাসা ছেড়ে আকাশে উড়ে বেড়িয়ে বেড়াস কেন? তুইও তো কিছু করতে পারিস?

আমি? আমার পয়সা কোথা?

বটাই সে সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে, আমার ক্ষ্যামতাই-বা কতোটুকু? চারটে ছানাপোনার মধ্যে তিনটেই তো মেয়ে। তাদের দ্বারা একটা বেড়া বাঁধায় সাহায্য মিলবে? যা সাহায্য মায়ের হাঁড়ি হেঁশেলে। তো মুখপাত ছেলেটাই বড় এই যা—ভাগ্যি! তাই নবছরে পড়তেই গলায় পৈতেটা ঝুলিয়ে দিয়েছি, ঠাকুরসেবার কাজে লাগতে পারবে বলে। তা করে। গৃহদেবতায় ওর খুব ভক্তি।

হঠাৎ আবার বলে ওঠে, আচ্ছা নাড়ুকাকা, কলকাতায় তোমারই-বা কী পেছটান বাবা? দুটো ছেলে তো লায়েক হয়ে নিজ নিজ পথ দেখেছে। ছোটটিও ওস্তাদের রাজা। নিজের ব্যবস্থা করেই নেবে। তোমরা বুড়োবুড়ি দুজনে ভিটেই এসে বসো না?

আমি দুটো কথাতেই চমকে উঠলাম! একটা হচ্ছে এ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দুজনকে এভাবে বাতিলমার্কা 'বুড়োবুড়ি' বলে অভিহিত করেনি।—আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে—এখানের মাটিতে পা দিয়ে পর্যন্ত আমারও মনের মধ্যে হঠাৎ ওই কথাটা যে 'টু' দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলো—'থেকে গেলে কেমন হয়? এখানে থেকে গেলে কেমন হয়?'—একদা যেখানটা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে গিয়েছিলাম, সেখানটা কেন এমন মোহজাল বিস্তার করে লোভের হাতছানি দিচ্ছে? হয়তো নীলোৎপল ডাক্তারের সেই শেষের সময়কার আকস্মিক আর অদ্ভুত আকুলতা আমাকে ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে তো এই লোভের হাতছানিতে সাড়া দেওয়া যায় না। কল্যাণীর প্রশ্ন নেই? কল্যাণী তার ছোটছেলেকে ছেড়ে দু-পাঁচ দিনও কোথাও থাকতে পারে না তা জানি তো।—এবার যে এমন বেরিয়ে পড়েছে, পিছনে তো ছিলো অন্য ইতিহাস।—

তাছাড়া—এমন যেন কল্যাণী ওই রিচি রোডের বাড়িটায় থাকতে

পারছিলো না।—মনের মধ্যে একটা 'পালাই পালাই' ভাব ঠেলা মারছিলো। তাই বেরিয়ে এসেছে।

আমি তাই বটাইয়ের কথাকে আমল না দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, তোর নাড়ুকাকাও তো করিৎকর্মা। সে তার ভাঙা ভিটেয় এসে বসে, তার হাল ফেরাবে। এ ব্যাটা কোনো কর্মের নয়। আর বয়েস কতো হলো তা জানিস?

হলো সত্তর আশি কিছু। তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি বাবা এখনো এই হতভাগা বটাইয়ের থেকেও চাঙ্গা আছো। তো খুড়ি! এখন আর চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত 'হরিমন্দিরের' দিকটায় যাবে? সেটা নাকি বানিয়ে পাবলিককে দান করে গেছলো বুড়ো ঠাকুর্দা! অনেক নাকি দানধ্যান পুণ্যিটুণ্যি করতো বুড়ো। তবে শুনতে পাই নাকি বাঘের মতো ছিলো। তুমি তো ছোটকালে দেখেছ গো নাড়ুকাকা?

আমি একটু হাসি।

বলি তা দেখেছি। এবং দেখে বীতরাগ হয়ে দেশত্যাগী হয়ে গেছি।

কেন গো? মোদোমাতাল ছিলো বুঝি? বড়লোকের যা বাঁধা রোগ।

এই খবরদার। যা-তা বলবি না। মহাসাত্ত্বিক ব্যক্তি ছিলেন আমার পিতামহ। তবে হ্যাঁ, 'মদমত্ত' ছিলেন! দম্ভমদে মত্ত। অসীম দম্ভ, অসীম অহংকার এই দুটোয় তাঁর বহুবিধ সদ্‌গুণকে নষ্ট ধ্বংস করে ফেলেছিলো। হয়তো যুগে যুগে সর্বত্র তাই ঘটে।—একবার 'ক্ষমতা'র আস্বাদ পেলে, কর্তৃত্বের আস্বাদ পেলে তার মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ওই দম্ভ আর অহংকার! মানুষকে 'মানুষ' জ্ঞান না করা। আমাদের পিতামহ—

এই সময় বটাইয়ের বড় মেয়ে ডাকতে এলো। বললো, বাবা! মা বলছে, আর কতোক্ষণ এনাদের রোদে ঘুরাবে? মা শরবত নিয়ে বসে আছে।

বটাই আবার হ্যা হ্যা করে হেসে বলে ওঠে, শরবত? তোর মার শরবত তো সেই বাতাসা ভিজোনো জল? তাতেই খানিকটা গাছের

লেবুর রস টিপে বলবে, 'শরবত খাও'। সে জিনিস তোর বাবা পরম পদার্থ করে খেতে পারে, এনারা পারবেন ? তার চে বাবা চা'ই ভালো। চেনা জিনিস। সেটাই আর একবার হয়ে যাক বরং।

কল্যাণী উঠে এসে বলে, আঃ। বটাই, তুমি এমন সব আজেবাজে কথা বলো। চলো তো ভাই দেখি তোমাদের গাছের লেবুর স্বাদ কেমন ?

মেয়েটা ফিক করে একটু হেসে ফেলে বলে, শুধু 'আমাদের' কেন ? আপনাদেরও তো। মা তো বলছিলো আপনাদেরই বেশী বেশী।

ও মা। এমন অদ্ভুত কথা বলবে কেন তোমার মা ?

তা জানি না। বলছিলো তো। আপনারা খুব ভালো, তাই কখনো কিছু বলেন না। আরো যে সব জ্ঞাতি আছে না ? তারা হঠাৎ হঠাৎ বাবাকে চিঠি দেয়, 'আমবাগানের জমা ধরার টাকার কী হলো ?' বাঁশবাগানের বিক্রীর টাকা কী হলো ?'

বটাই হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে, তুই থামবি ? এই এক মেয়ে হয়েছে, পাকার ধাড়ি। বাবা তো একে দেখে গেছে। বলতো, এটা নির্ঘাৎ আমাদের 'পিসি'টি মরে আবার এসে জন্মেছে ! ভীষণ মায়া ছিলো তো এই ভিটের ওপর পিসির।

আমার হঠাৎ মনে হয় বটাইয়ের কথাটা বুঝি সত্যিই। ওর ওই বছর তেরো-চোদ্দর মেয়েটার খরখরানি ভাবটা যেন আমাদের সেই খটখটি পিসির মতোই। তফাতের মধ্যে এ এখনো ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ছেলেবেলায় আমার এ বয়েসের দিদিদের কখনো ফ্রক পরতে দেখিনি। এ বয়সের কেন, আরো ছোটও।

আমরা ছেলেরাও তো সেই জ্ঞানোদয় থেকে ছোট্ট ছোট্ট ধুতিই পরেছি মালকোঁচা এঁটে। এ বাড়িতে 'ম্লেচ্ছ সাজ' ঢুকতে পেতো না। বছরের কোন কোন সময় যেন তাঁতীবাড়ি থেকে গাঁটরিভর্তি কাপড় আসতো। প্রমাণ সাইজের ধুতি শাড়ির গাদা, আবার অ-প্রমাণ সাইজেরও বস্তা।

মাসে মাসে টাকা নিয়ে যেতো বোধহয়। তবে--শুনেছিলাম ওই তাঁতীর তাঁতঘরের জমিটা নাকি ঠাকুর্দার দাতব্য।—নিজেকে দেখতে

পাচ্ছি চার-পাঁচ হাত একখানা মোটা কোরা ধুতি মালকোঁচা করে পরা। কোঁচার থেকে কাছার ওজনটা বেশি। কিন্তু ওই 'কোরাত্ব'টা ক্রমশই কুটকুটানি ধরাচ্ছে। আর আস্তে আস্তে পুরো ধুতিটা পুঁটুলি প্যাকিয়ে বগলদাবার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে।—ধুতির মালিকের অবস্থা বাবা আদমের মতো।

ভীষণ টানছে সেই উঠোন, দালান, বৈঠকখানা বাড়ি। যেখানে ঘুরে বেড়াতো ছেলেটা।

বটাইয়ের বৌ দেখতে সুশ্রী নয়, রোগা, কালো, দাঁতউঁচু। এর মধ্যেই সামনের চুলগুলো সাদা হয়ে এসেছে, কিন্তু তার ভিতরটি বড় সুন্দর, বড় শ্রীমণ্ডিত।

দেখলাম, কল্যাণীর সঙ্গে দারুণ জমে গেছে। কল্যাণীই জমিয়েছে অবশ্য। রান্নাঘরের দাওয়া, যে রান্নাঘরে পিসিদের রান্না হতো, সেটাই এদের কাজে লাগছে। এখানটাই বেশ শক্তপোক্ত।

ভাঙাচোরা হলেও বাড়ির কাঠামোটা দেখে কল্যাণী অবাক হয়ে যায়। এতো বড় বাড়ি। একেই বুঝি বলে চকমিলোনো? কী মোটা মোটা থাম রে বাবা! তবু ধসে পড়ছে! দোতলা তিনতলায় এরা কেউ ওঠে না। হাঁটলে কেমন কাঁপে। তাছাড়া উঠবেই-বা কে? লোক কোথায়?

বটাইয়ের বৌ মঞ্জু বলে, মাঝে মাঝে ঝাড়ামোছা করতে উঠি। অতো ঘরদোর, পুরনো পুরনো আসবাবে ঠাসা, দেওয়ালে দেওয়ালে রংজ্বলা সব ফটোছবি।—দেখে গা কাঁপে। একা উঠি না। ছেলেমেয়ে কাউকে সঙ্গে নিয়ে উঠি। আর ওইসব ছবিদের একবার করে প্রণাম করে আসি। সবাই তো গুরুজন।

চটাওঠা খাপরিওঠা দালান বারান্দা উঠোন এদিক সেদিক। অথচ ওরই মধ্যে সবই যেন বেশ তকতকে।

কল্যাণী বললো, আচ্ছা দুদিন থেকে তো দেখছি, কোনো কাজের লোক তো দেখছি না। এতোসব পরিষ্কার করে কে?

বটাই শুনে হেসে ওঠে, আবার কে? ওই যে জঙ্গীপুরের চৌধুরীবাড়ির বিনি মাইনের চাকরানীটি! ওরই তো কম্ম। নেশাগ্রস্তর মতো এই ভাঙা ভিটেকে সাফ করে করে মরেছে। উঠোনে

একটু শুকনো পাতা পড়লো তো, ছুটলো ফেলে দিতে।

মঞ্জু একটু হেসে বলে, কী আর করবো বলুন? আর কোনো কাজ তো শিখিনি। যা শিখেছি তাই করি। একা একা যখন হাঁ-হাঁ খাঁ-খাঁ করা বাড়িটাকে দেখি, মনটা যেন কোথায় চলে যায়। ভাবি, শুনি নাকি এই বৃহৎ বাড়িটা লোকে ঠাসা ছিলো। রাতদিন সেই যাকে বলে, 'ঢেঁকি পড়ন্ত উনুন জ্বলন্ত' সেই রকম। পাড়ার দু-একজন গিন্নীটিন্নী মাঝে মাঝে এসে গল্প করেন। বলেন 'কত বোলবোলাও দেখেছি'। আমি ভাবি এই মঞ্জুর ভাগ্যেই সব উপে গেছে।—তাও দেখুন না বাড়ির একটা মানুষ তো, বাড়িতে মন টেঁকে না। পায়ে চাকা বেঁধে ঘুরে বেড়াবেন, না কী আমার হাতের রান্না খারাপ! লোকের বাড়ির রান্না ভালো—

কল্যাণী রেগে উঠে বলে, বটে? তুমি সেই কথা সহ্য করো। রাগ করো না?

ও ওর সেই ঈষৎ উঁচু দাঁতে একটু হাসে, রাগ করে কী হবে খুড়িমা? ফল হবে কিছু?

তাই বলে, উনি বাবু সব দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবেন, আর তুমি এইভাবে ওরই বাপ-ঠাকুর্দার ভাঙা ভিটে আগলে তার সেবা করে মরবে? এ তো আচ্ছা!

মঞ্জু তেমনিভাবেই বলে, তা খুড়িমা 'ওর' ভাবলে ওর। 'আমার' ভাবলে আমার। আমারও তো শ্বশুরকুলের ভিটে। ও আমায় এখানে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে বলেই না দুবেলা ঝাড়ামোছা হচ্ছে, তুলসীতলায় পিদিমটা জ্বলছে, ঠাকুরঘরে ঠাকুর সেবাটুকুও চলছে। আমায় কলকাতায় নিয়ে একখানা কী দেড়খানা ঘরে বাসা বেঁধে যদি রেখে দিতো, এতো ঐশ্বর্য ভোগ করতে পেতাম? এতো আলো, এতো বাতাস, এতো স্মৃতিতে ঠাসা বৃহৎ বাড়ি। সেখানে একটা তুলসী গাছ পুঁততে ঠাঁই হতো না। অথচ এখানে আমি—কতো গাছ-গাছালি করেছি। আলুটা ছাড়া প্রায় সবই ফলাচ্ছি খেটেখুটে।

ওই তো দেখো এবার।

বটাই হেসে হেসে বলে, ব্যাপারটা বুঝছো খুড়ি? বটাই হতভাগা বার দুই চেষ্টা করেছিলো কলকাতার আনাচে-কানাচেয় একটু বাসা

করতে। তো ইনিই গররাজী। বলেন, রক্ষে করো। পাঁচজনের সঙ্গে 'এক' নাইবার ঘর, 'এক' সদর! আব্রুর বালাই নেই। আর এখানে চারিদিক ভেঙে পড়েছে, তবু মনে হয় মস্ত একটা দুর্গের মধ্যে আব্রুর আড়ালে রয়েছি। অনুভবে জানছি, আমি এই জঙ্গীপুরের চৌধুরী-বাড়ির বৌ।—আর এখানে সবাই সেই পরিচয় মেনে সমীহ করছে।

ওই তো।

বটাই আবার হ্যা হ্যা করে হাসে। বলে, মরবে কোনদিন সাপের কামড়ে। যতো রাজ্যের ভাঙা ইঁটের স্তূপ, তার মধ্যেই তো সাপখোপ থাকে।

কল্যাণী বললো, সাপখোপ সর্বত্রই থাকে বাবা। সবাইকেই 'সাপ' বলে চেনা যায় না। কাউকে হয়তো চেনা যায়।

এই সময় বটাইয়ের কিশোর পুত্র শুভ্রনারায়ণ ঠাকুরঘর থেকে থেকে বেরিয়ে এলো। পরনে একটা তসরের ধুতি, গায়ে উত্তরীয়। তার ফাঁকে ধবধবে পৈতে।—হাতে একটু রেকাবিতে প্রসাদের বস্তু।

দেখে চমকে উঠলাম।

এ কাকে দেখছি? আমার সেই পিতামহর কিশোর মূর্তি না কী। তেমনি দুধে গরদের মতো গায়ের রং, তেমনি ঋজু দীর্ঘ দেহ, তেমনি উন্নত নাসা দীর্ঘ কপাল, ঘন পল্লব চোখ।—কতো বয়েস এর, বড়জোর সতেরো আঠারো। বলছিলো উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। অথচ মনে হচ্ছে, আস্ত একটা পুরুষ মানুষ। সেই জগৎনারায়ণের মতই দীর্ঘদেহী, তবে পাতলা।

ঠাকুর্দার মতোই ও ধীরভাবে সকলের হাতে হাতে একটু করে ভিজে ছোলা, একটা করে কলা আর ছোট একটা করে নারকেল নাড়ু দিয়ে দিয়ে শেষটুকু নিজের হাতে তুলে নিয়ে রেকাবিটা নামিয়ে রাখে।

কী ধীর ছেলে।

আমি বিহ্বলভাবে বলি, এখনো জনার্দন নারকেল নাড়ু খেয়ে চলেছেন?

মঞ্জু অবশ্য আমার জ্যেঠিমা বা বৌদিদের মতো ঘোমটামুড়ি নয়। মাথায় সামান্যই কাপড়। খুড়শ্বশুরের সঙ্গে সহজভাবে কথা কইছে। একটু হেসে বললো, তা জনার্দন যখন নারকেল গাছগুলোয় ফল ফলিয়ে চলেছেন এখনো, বঞ্চিত হবেন কেন? কলাও তো বাড়িরই গাছের। আসলে, জনার্দনই তো আমাদের খাওয়াচ্ছেন। অথচ আমরা ভাবছি 'আমি জনার্দনকে ভোগ দিচ্ছি।'

কল্যাণীকে এখন আমি দেখিয়ে বেড়াচ্ছি। বলছি—দেখো এই যে লম্বা মস্ত ঘরখানা? গরমের ছুটির সময় এই ঘরে জগুদা আমাদের দুপুরে অন্ধকার করে আটকে রাখতো, পাছে লোকেদের ছেলেদের সঙ্গে রোদে রোদে ঘুরি! এখন দেখো দরজার কপাটগুলো লোপাট। আর কোনো জগুদার সাধ্য নেই, কোনো ছেলেকে আটকে রাখে।—

দেখাই, এই দেখো—পৈতে হবার পর এইখানে এক বছর আমি ঠাকুর্দার সঙ্গে থেকেছি, স্বপাকে খেয়েছি।—এখানটা বেশ শক্তপোক্ত আছে দেখছি। আলাদা একটু একতলা কিনা। বোধহয় পরবর্তী সংযোজন—দেখাই—এই দেখো—এই সেই তিনতলার কোণের ঘর। যে ঘরে ডেকে এনে পিসি আমায় অফার করেছিলো, আমার মা-বাবার সোনাটোনাগুলো নিয়ে সরে পড়তে।—নিইনি বলে রাগ করে আর কথা বলেনি। তারপর আর দেখাই হলো না।—দেখিয়ে বেড়াই—এই দেখো আমবাগানের সেই দোলনা। বড়জ্যাঠা বেঁধে দিয়েছিলো।

কী আশ্চর্য, এখনো রয়েছে!

তাই দেখছি। খুব মজবুত দড়ি।

লোকে কেটে নিয়ে পালায়ওনি তো।

সেটা আশ্চর্য বটে। হয়তো কারো চোখে পড়েনি। নয়তো বা ভয়ে হাত দেয়নি।

ভয় আর কার? পাহারা কোথায়?

শুনে আমি হাসলাম।

বললাম, গ্রামের লোকেরা আবার এখনো 'বৃক্ষদেবতা' 'ভূতে ভর করে থাকা' এসবে বিশ্বাসী তো? ভেবে থাকবে, যিনি দড়ির বন্ধন করে রেখে গেছেন, তিনি হয়তো অলক্ষ্যে পাহারা দিচ্ছেন।

কল্যাণী হঠাৎ গাঁইয়ার মতোই বলে বসে, হয়তো অসম্ভবও নয়।

আমি বলি, সব তো দেখাশোনা হলো, এবার টিকিট কেনা হোক।

কল্যাণী হঠাৎ আমার বাহুতে একটা হাত রেখে ব্যগ্রভাবে বলে, ওঠে, আচ্ছা, এখানে থেকে গেলে কেমন হয়?

এখানে থেকে গেলে!

কল্যাণী বলে, দেখো এসে পর্যন্ত আমার একথা মনে হচ্ছে। লজ্জায় তোমায় বলতে পারছি না। সত্যিই বলো সেখানে আর আমাদের কী আছে? কী দায়িত্ব? কী করণীয়?

আরে বাস! তোমার ছোট পুত্তুরটি! মায়ের আঁচলধরা তোমার কোলের ছেলেটি! তাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?

কল্যাণী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

বললো, সেই ভুল ধারণাটাই আঁকড়ে ছিলাম বটে এতোদিন। এখন অনুভব করছি, আর একখানা আঁচলের সন্ধান পেলেই ও নিজেই আমায় ছেড়ে যাবে। সে আঁচল তো জরি রেশমে জমকালো হবেই। —হয়তো হাতের কাছে মজুতই আছে।

বটাই একটানা দশ দিন বাড়িতে। এ নাকি এক অভাবিত ঘটনা।

আমাদের জন্যেই। দেখে মনে হচ্ছে আমরা পিছন ফিরলেই বটাইও পিটটান দেবে।

এ হেন সময়, কল্যাণী বলে বসলো, আচ্ছা মঞ্জু, ধরো যদি আমরা এখানে থেকে যেতে চাই? তুমি কিছু অসুবিধে বোধ করবে না তো?—

মঞ্জু চমকে উঠে এগিয়ে এসে কল্যাণীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, অসুবিধে? ও খুড়িমা, এ আপনি কী বলছেন? কৃতার্থ হয়ে যাবো বললেও কিছু বলা হবে না। কিন্তু একবার যখন মুখ দিয়ে বার করেছেন, তখন আর নড়চড় নয়। ও কাকা! আপনি সাক্ষী।—

আমি বলি, আরে এই বটাই তখন কী বলবে জানো? বেশ

ছিলাম বাবা। নাড়ু খুড়ো আবার জ্ঞাতি-শত্তুরতা সাধতে এলো।—

বটাই সেই নিজস্ব ভাবে হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, তা আর নয়? বটাইয়ের তো তাহলে পাথরে পাঁচকীল।—সংসারে একটা গার্জেন থাকলে বটাই তো বাপের সঙ্গে বর্তে যাবে!

কল্যাণী একটু হেসে বলে, কিন্তু মঞ্জু আমি মোটেই তোমায় কৃতার্থ করতে বা তোমার বরটিকে বর্তে দিতে এখানে থাকতে চাইছি না—বলতে গেলে তোমার সুখের অবস্থাটি দেখে হিংসেয় বলে বসছি। ভাবছি, সত্যি এতো আলো, এতো হাওয়া, এতো জায়গা, এতো ঐতিহ্যের ভার একা ওই মেয়েটাই ভোগ করবে? আমিও তো সেটা করতে পারি।

আমি তো চিরকালই কল্যাণীকে বুঝতে পারি না এখনো, একটু হকচকিয়ে বলে উঠলাম, আহা! কেন বেচারীকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ? তোমার যা কড়া ঠাট্টা, সবাই বুঝতে পারে না।

কল্যাণী বলে, ঠাট্টা করছি না তো। সত্যি কথাই বলছি তো, সত্যিই হিংসে হচ্ছে যে।—

মঞ্জুকে যে কেন কল্যাণী এই ক'দিনেই এমনভাবে 'একসেপ্ট' করে নিতে পেরেছে, বুঝতে পারলাম! মঞ্জু বলো উঠলো, বেশ তো, তাতেই বা কী? 'জ্ঞাতি' বলে কথা। হিংসেরই তো সম্পর্ক! দুই জ্ঞাতি শাশুড়ী বৌ-তে দু-বেলা কোমর বেঁধে লাঠালাঠি হবে। পাড়ার লোক 'মজা' দেখতে আসবে। এতোদিনের মরে পড়ে থাকা চৌধুরীবাড়িতে তবু একটু প্রাণের সঞ্চার হবে।

এমন উত্তর কি আমার নিজের ছেলেদের দারুণ বিদুষী বৌদের কেউ দিতে পারতো?

আমি দুজনের দিকেই তাকাচ্ছি।

এই উচ্ছ্বাস এই আবেগ এ কী স্থায়ী হওয়া সম্ভব? কিন্তু কল্যাণী তো কখনো আবেগ উচ্ছ্বাসের শিকার হয় না। কল্যাণী তো চিরআত্মস্থ। এখন আমার নির্লিপ্তির ভূমিকাই শ্রেয়।

তাই আস্তে বলি, তাহলে কী বটাই, টিকিট কিনতে যাওয়াটা বন্ধ রাখবে?

আর সেই সময় শুনতে পাই আমার 'পিসি মরে জন্মানো' বটাইয়ের

ওই মেয়েটা হি হি করে হেসে বলে, ‘মা নইলে আর কোমর বেঁধে লাঠালাঠি করবে কে? জগতের অতি ঝগড়ুটেরও সাধ্যি নেই, আমার এই মা-টির সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে পারে। বাবা তো হেরে গেছে।—হি হি, বলে, তোদের মায়ের ‘মনের গা’টা কী দিয়ে তৈরী রে? গণ্ডারের চামড়া দিয়ে? কাস্তে কোদাল শাবল গাঁইতি যাই ছোঁড়ো, গড়িয়ে ফিরে আসবে, কোপ বসাতে পারবে না। উঃ! বাবা কী মাকে কম জ্বালায়? আমাদেরই বাবাকে ধরে ঠেঙাতে ইচ্ছে করে, অথচ মা একদম গায়ে মাখে না।’

বটাই বলে ওঠে, তোদেরই ইচ্ছে করে বাবাকে ধরে ঠেঙাতে?

করেই তো। তুমি যা দায়িত্বহীনের মতো কাজ করো। মরা মানুষেরও রাগ হয়।

বটাই দিব্যি হেসে হেসে বলে, দেখছ নাড়ুকাকা! দেখছ? মেয়ের আমার বাক্যিবুলি দেখছ? এই সইতে হয় আমায়।

হেসে উঠে বলি, তা উপায় কী? যখন প্রমাণ পাওয়া গেছে পিসি এসে জন্মেছে। বিশ্বসংসারে কাউকে কখনো যে রেয়াৎ করে চলতো না।

মেয়েটা বলে, মাকেও তো কম ধিক্কার দিই নাগো ‘নাড়ু ঠাকুমা’। বলি, ‘তুমি আবারও বাবা যেই আসে, সেই হেসে হেসে কথা কও?—প্রাণপাত করে ভালোমন্দ খাওয়াতে বসো? লজ্জা করে না? অন্য মেয়ে হলে, মুখ দেখতো না!—ডিভোর্স দিতো। তা মা কী বলে জানো? তাতেই কী আর আমার সুখ জুটবে ভেবেছিস? কথাতেই আছে, আমি যাই অঙ্গে বঙ্গে কপাল যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে।—স্বয়ং মা দুর্গাকেই যখন গেঁজেল নেশাখোর ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের ঘর করে মরতে হচ্ছে, তখন আমি তো কোন ছার!’

বটাই ফের হাসতে থাকে।—শোনো! তোমরা শোনো।

আমি আর একবার ওই রোগা কালো দাঁতউঁচু মেয়েটার দিকে তাকাই। ওকে কী আমি নির্বোধ বলবো? ‘সেকেলে’ বলবো? ‘ভারতীয় নারীর’ পরাকাষ্ঠার নমুনা ‘পতিব্রতা’ বলতে বসবো?

আমি তো দেখছি এই গ্রাম্য মেয়েটা কী দারুণ বুদ্ধিমতী!

কল্যাণীর সঙ্গে ওর সংঘর্ষ হবে না! কল্যাণী 'বুদ্ধি'কে বড় শ্রদ্ধা করে। 'বুদ্ধি'কে বড় ভালোবাসে।

সকাল হয়ে গেছে। তবু বিছানায় পড়ে আছি।

কোথা থেকে যেন সেই সেদিনের মতো একটা চেনা গন্ধ ভেসে এলো। কী মাস এটা? কী ফুল ফোটে এখন?

দেখি বটাইয়ের ছোট মেয়ে দুটো একটা চুপড়ি ভরে রাশ করে শিউলি তুলে এনেছে।—কতোদিন এরকম চুপড়ি দেখিনি।

কী আশ্চর্য! এ রকম চুপড়ি ওরা পেল কোথায়? ঠিক এই রকম চুপড়ি ভরে ভরে আমার সব 'তুতো' দিদিরা এমনি করে শিউলি ফুল তুলে আনতো!

আমি বলতাম, এতো ফুল তুলে কী হবে?

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়তো। শোন হাবাটার কথা? 'এতো ফুল তুলে কী হবে?' তোলার জন্যেই তোলা। ফুল আবার কী হবে? চচ্চড়ি রেঁধে খাওয়া হবে নাকি শাকের মতন?—আর আমাদের তোলা ফুল তো ঠাকুর্দা ঠাকুরকেও দেবে না।—

এদের বললাম, আরে বাস! এতো ফুল কোথায় পেলি?

ওরা উদ্ভাসিত মুখে বললো, কেন, বৈঠকখানা বাড়ির পেছনের জমিটায় দু-দুটো ইয়া প্রকাণ্ড শিউলি গাছ রয়েছে না? যা মোটা গুঁড়ি! গাছ নাড়া দিয়ে ফুল ঝরাতে দুহাতে ধরতে গিয়েও নাগাল পাই না। এখনো গাছে কতো ফুল। রোদ উঠলে ঝরবে।

অবাক হয়ে যাই।

সেই গাছ দুটো এখনো আছে?

এখনো ফুল দেয়।

দিদিরা তো ওইখান থেকেই ফুল আনতে যেতো।

হয়তো সেই গাছ দুটোই। হয়তো-বা তাদেরই দাক্ষিণ্যে জন্মে ওঠা তাদের সন্তানসন্ততি নতুনরা।—তবে ওখানটাই ছিলো দিদিদের আহরণ ক্ষেত্র।

ভাবলাম, যাই তো দেখিগে।

বললাম, চল আমি নাড়া দিয়ে দিইগে।

অ্যাঁ? তুমি? কী মজা। কী মজা। ও দিদি, নাড়ু ঠাকুর্দা

গাছ নাড়া দিয়ে দিতে যাচ্ছে—

গেলাম।

দেখলাম, সত্যিই ঠিক সেইখানেই দুটো গাছ অজস্র ফুল ঝরিয়ে রেখেছে। নাড়া দিতে আরো ঝরলো।—

ওদের কী কলরব। ও বাবা। কতো পড়ছে এখনো। উঃ, মাঠটা সাদা হয়ে গেল।

আমি যেন সেই আমার দিদিদের কলকাকলি শুনতে পাচ্ছি। দেখছি কিছু কিছু ব্যাপার জগতে চিরকালীন।—গাছেরা যথাসময়ে ফুল দিতে আসবে 'বিনা রেখার পথটি চিনে চিনে'।—শিশুরা-বালকরা-বালিকারা সে ফুল শুধু তোলবার জন্যেই তুলবে।—সেই ক্ষণিকের সঞ্চয় নিয়েই কলকাকলিতে মুখর হবে।—

ওরা হৈচৈ করতে করতে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। ওদের বক্তব্যের সারাংশ বোধহয় এই 'ঠাকুমা ঠাকুর্দা' নামক দুটো প্রাণীর এখানে থেকে যাওয়ার উল্লাস।—

আমি কী চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি যে লোকটা এখানে ঘুরছে, সে প্রায় বাহাত্তরে পৌঁছনো নরনারায়ণ চৌধুরী নয়, সে নিতান্তই নাবালক, আটহাতি ধুতি-পরা 'নাড়ু' নামের বাপ-মরা আর মা-ছাড়া অভাগা সেই ছেলেটা মাত্র। সে নাকি ওই অতোবড়ো গুষ্ঠীতে অতো 'তুতো' ভাইবোনদের মধ্যেও এইরকম খাপছাড়াভাবে একা ঘুরে বেড়াতো। যার জন্যে সবাই তাকে বলতো 'হাবাটা'।

সে এখন তাই 'হাবার' মতোই একটা মৃত লোককে উদ্দেশ করে বলছে, ডাক্তার! তুমি তোমার শৈশবের স্মৃতির জায়গাগুলোয় যেতে চেয়েছিলে। পেলে না। না পেয়ে হয়তো ভালোই হয়েছে। তুমি তোমার মনে ধরে রাখা ঝলমলে ছবিটাকে হারিয়ে ফেলতে। তোমার স্মৃতির জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে রোলার চলে গেছে।—কিন্তু 'নাড়ু' নামের ছেলেটার ভাগ্য ভালো। সে কোনোদিন চায়নি, আকুলতা করেনি, আচমকাই এসে পড়েছে। তবু এসে দেখছে, তার জন্যে লক্ষ্মীর কৌটোয় সঞ্চিত সোনার ধানের কিছুটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে।—

ফিরে আসতে গিয়ে আবার থমকে, ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি কটা উঠে

বৈঠকখানা ঘরটায় উঠে এলাম। যেখানে বাড়ির সব কটা ছেলেকে একত্র করে দীনু পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক শেখাতেন। বেশীরভাগই 'মোহ মুদ্গর' থেকে। আর তারই অবকাশে ছেলেগুলো ঘরের দরজা-জানলার কপাটের পিছন দিকে পেন্সিলকাটা ছুরির আগা দিয়ে খুদে খুদে নিজেদের নাম লিখতো। লিখতো আরো যার যা ইচ্ছে।—দেখতে পেলাম একটা কপাটের পিছনে কে লিখে রেখেছে অনন্তনারায়ণ চৌধুরী। এ কে? মনে করতে পারছি না। বড়দার বড়ছেলে লিখে রেখেছে—পণ্ডিতের টিকিখানা লম্বা। বুদ্ধিতে রম্ভা।—আর একটা জানলার পিছনে নিচের দিকে লেখা—নাড়ুং ভালোং ছেলেং।'

এই তো, এইটাই তো খুঁজছিলাম। সেদিন কিছুতেই নজরে পড়েনি।—

দেখে হঠাৎ এতো আহ্লাদ হলো। যেন খুঁজতে খুঁজতে হারানো 'গুপ্তধন' খুঁজে পেয়ে গেছি।

এ লেখা হচ্ছে সেই নাড়ুর দীনু পণ্ডিতের প্রতি চ্যালেঞ্জ। সে তার দাদাদের কাছে অতি অগ্রাহ্যের সঙ্গে অতি সতেজে বলেছিলো, 'সমোসকৃতো' লেখা আবার কী এতো শক্ত? অনুস্বর লিখতে শিখলেই তো 'সমোসকৃতো' লেখা যায়। সব কথার পেছনে একটা করে অনুস্বর বসিয়ে দিলেই তো ব্যস।

লেখাটার দিকে তাকিয়েই আছি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে ঘরভরা লোক। দীনু পণ্ডিত ওই জানলামুখো হয়ে চৌকিতে বসে আউড়ে যাচ্ছেন, বল্ 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং। তদ্বৎজীবনমতিশয় তরলং।

আর এদিকে জানলার কপাটে কারিকুরি চলছে।

সেই ছুরির কাঠের বাঁটটার রংটাও চোখে ভাসছে। আর তার গায়ে যে অজস্র দাঁতের দাগ তাও দেখতে পাচ্ছি। বাঁটের কাঠটা চিবোলে তো আর জিভ কাটবে না।—পণ্ডিত মশাই যতোক্ষণ ওই সব বলবেন ততক্ষণ নাড়ু করবেটা কী?

লেখাটা খুঁজে পেয়ে মনে হয়েছিলো যেন কী ঐশ্বর্যই পেয়ে গেলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশই কৌতুক অনুভব করছি।

কাকে ডেকে দেখিয়ে মজা পাবো? সেদিনের কোনো সাক্ষীই তো কোথাও অবশিষ্ট নেই।

আজকের ক্ষুদেদের কাছে গল্প করতে গেলেই কী এরা তার কৌতুকরসটা অনুধাবন করতে পারবে?

শেষ পর্যন্ত আর কী? আমার সকল কথার শ্রোতা, সকল কথার ভাণ্ডারী কল্যাণীকে ডেকে দেখাতে হবে।—

ইদানীং ক্রমশই যেন মনে হচ্ছিলো, কথা কইবার বিষয়বস্তু বুঝি কেমন কমে গেছে। কথা ফুরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো, এই বৃহৎ বাড়ির ভাঙা ইঁটের খাঁজে খাঁজে, মোটা মোটা থামের ফাটলে ফাটলে কতো কথা জমা হয়ে আছে। তারাই হয়তো এক একসময় মুখর হয়ে বেরিয়ে এসে কথার যোগান দেব।—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে বলে উঠবে, 'কিছুই হারায় না। সবই কোথাও না কোথাও জমা থাকে। শুধু কখনো দূরে সরে যায়, কখনো বা কাছে এসে দাঁড়ায়'।

— —